# পশ্চাৎপট

রমাপদ চৌধুরী

This Book Downloaded From
http://Doridro.com

আপনার কাছ থেকে আমার চিঠির উত্তর আসবে আশা করিনি, পেয়ে অবাক হয়ে গেছি। দারুণ খুশি হয়েছি। তবে সত্যি কি আশা করিনি? তা হলে চিঠি লিখলামই বা কেন, উত্তরের জন্যে অনুরোধই বা করেছিলাম কেন। মনের মধ্যে একটু লুকনো আশা নিশ্চয়ই ছিল।

আপনি জানিয়েছেন আমার অনুরোধ রক্ষা করা আপনার পক্ষে সম্ভব নয়। উল্টে আপনি আমাকেই উপদেশ দিয়ে বসেছেন যে আমার কাহিনীটা যেন আমিই লিখে ফেলি। স্পষ্টভাবে 'উপদেশ' শব্দ আপনি ব্যবহার করেননি ঠিকই, কিন্তু আপনার চিঠির মূল্য বক্তব্য বুঝতে আমার অসুবিধে হয়নি। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে আপনি জানিয়েছেন আপনার ব্যস্ত জীবনে আমার সঙ্গে দেখা করার এবং আমার কাহিনী শোনার মতো সময় আপনার নেই।

দেখুন বাইরে থেকে দেখে যে-মানুষকে যাই মনে হোক, পৃথিবীর সব মানুষই কিন্তু ব্যস্ত। ব্যস্ততা কি শুধু শরীরকে ঘিরেই হয়! মনেরও তো ব্যস্ততা থাকে। সদ্য পুত্র-হারা মা, যে একা বসে বসে কাঁদে বা কান্না চাপে, কিংবা অর্থহীন চোখে সামনের মানুষটিকে দেখেও দেখে না, শুধুই উদাস বিষণ্ণতায় তাকিয়ে থাকে, পৃথিবীতে তার চেয়ে ব্যস্ত মানুষ কি আর কেউ আছে! অথচ ইচ্ছে থাকলে তারই মধ্যে তো সকলেই সময় করে নেয়, নিতে হয়। না, আমি কোনও অভিমান জানাচ্ছি না। এত ব্যস্ততার মধ্যেও তো আপনি আমাকে একটা চিঠি দিয়েছেন, কয়েক পাতা জুড়েই, যা লিখতে গিয়ে নিশ্চয় আপনার অনেকখানি সময় নষ্ট হয়েছে। আমি চেয়েছিলাম আমার অভিজ্ঞতার গল্প আপনার কলমেই প্রকাশ পাক, তার বদলে আপনি আমার ওপরেই সেই দায়দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়েছেন। তা

This Book Downloaded From
http://Doridro.com

সত্ত্বেও বলতে কি, আমি খুশিই হয়েছি। যদি চিঠির উত্তর না পেতাম, কিংবা নিতান্তই চার লাইনের দায়সারা কোনও জবাব পেতাম তা হলে নিশ্চয় এ বয়েসেও আমার কান্না পেয়ে যেত। মনে আঘাত পেতাম, অপমানিত বোধ করতাম। এখন বরং মনে মনে আমি কৃতজ্ঞতা বোধ করছি। কৃতজ্ঞতা আর একটা কারণে, আপনি আমার মতো নগণ্য মানুষের মধ্যেও একজন লেখককে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। যদিও সে শক্তি আমার মধ্যে নেই, আমি জানি তা সত্ত্বেও আপনার উপদেশ বা আদেশ আমি শিরোধার্য বলে মনে করি।

আমার মতো বিচিত্র উত্তরাধিকার নিয়ে আর কেউ জন্মেছে কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু ভেবে দেখেছি, এই বিশাল পৃথিবীতে আমার মতো মানুষ হয়তো আরও আছে। তাদের খবর কে-ই বা রাখে! রাখার প্রয়োজনও হয়নি, বাইরে থেকে দেখে তো মনে হয় তারা সকলেই সকলের সঙ্গে দিব্যি মিলেমিশে আছে। সকলের মতো তারাও হাসে, তারাও কাঁদে, তারাও সাফল্য পায়, ব্যর্থতায় কষ্ট পায়। অথচ তারা ভিতরে ভিতরে জানে, তারা সকলের থেকে আলাদা।

আমাদের পরিবারটি আজকালকার মতো, একালের আধুনিক পরিবারের মতো সংক্ষিপ্ত ছিল না। ছিল না বলেই নিজেকে ভাগ্যবান মনে করি। বাবা-মা আর একটি কি দুটি সন্তান নিয়ে যাদের সংসার তারা অনেক সুখে থাকে বলেই তো মনে হয়, কিন্তু এও জানি এমন একটি ক্ষুদ্র সংসারের সন্তান হলে আমার জীবন কী দুর্বিষহ হয়ে উঠত।

একটি শিশু জন্মের পর থেকেই যা দেখে আসে তাকেই স্বাভাবিক মনে করে। বাবা-মায়ের আঙুল ধরে হাঁটতে শেখার আগেই কিন্তু সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, ঠিক যেভাবে সে উপুড় হওয়ার চেষ্টা করে, হাঁটুতে ভর দিয়ে হামাগুড়ি দিতে শেখে, ঠিক সেভাবেই সে অপরের সাহায্য না পেলেও খাটের পায়া কিংবা একটা টুল ধরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করে, উঠে দাঁড়ায়, এমন কি পা ফেলে হাঁটারও চেষ্টা করে। হাত ধরে কেউ হাঁটাবার চেষ্টা করলে কাজটা তার পক্ষে সহজ হয় এই অবধি।

একেবারে শৈশবের কথা আমার অল্পই মনে পড়ে।

নিজের সম্পর্কে যেটুকু জেনেছি তা দাদু ও ঠাকুরমার কাছে কালেভদ্রে শুনে শুনে। কখনও কখনও ঠাম্মা হয়তো নিকট আত্মীয়জনদের সঙ্গে মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে দিব্যি গল্পগুজব করছেন, আমি গিয়ে হাজির হয়েছি হঠাৎ, তাঁদের গল্প মুহূর্তে ঘুরে দাঁড়িয়েছে আমাকে নিয়েই, ঠাট্টা রসিকতার মোড়কে মুড়ে আমার আরও কম বয়েসের কোনও ঘটনার উল্লেখ করেছে কেউ, তারপর দল বেঁধে তাঁদের হাসি উপচে পড়েছে। আমি অস্বস্তি বোধ করেছি। ওই হাসির কেন্দ্রে কোনও উপহাস আছে, না কি নিছক রসিকতা, তাও বুঝতে পারিনি।

কিন্তু একটা ব্যাপার আমার খুবই অদ্ভুত লাগত, খারাপ লাগত। সেখানে হঠাৎ বাবা কিংবা মা এসে পড়লেই, সকলে কেমন চুপচাপ হয়ে যায়। দু'-একজনের মুখে কেমন একটা হাসি দেখা দিত, বাদবাকি সকলেই গম্ভীর কিংবা চুপচাপ। মা হয়তো টেনে নিয়ে যেতে চাইল, ঠাম্মা পান চিবোতে চিবোতে হাতের ইশারায় জানালেন, থাক্ থাক।

মা ঠাম্মার কথা মেনে চলে যেত।

একজন একদিন হাসতে হাসতে বলেছিল, তুমি তো অমুকে জন্মের থেকেই নিজের কাছে নিয়ে শোও, ওর মা তো কাছেই পায়নি।

আমার নাম অমৃত কে দিয়েছিল জানি না। হয়তো দাদু কিংবা ঠাম্মা, আর অমৃত নাম থেকেই বাড়িতে সকলে আমাকে অমু বলেই ডাকতো। সকলে?

আপনি হয়তো ভুল বুঝবেন, সে-জন্যে জানিয়ে রাখি ঠাকুমা আমাকে সব সময়ে মায়ের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে চাইত, কিংবা মায়ের কাছে যেতে দিত না, তা নয়। এ কাহিনী তো আমি বইপড়া পাঠকদের জন্যে লিখছি না, লিখছি আপনার জন্যে।

আমি যে জন্মের পর থেকেই, কিংবা খুব ছোটবেলা থেকেই ঠাকুরমার কোল ঘেঁষে শুয়ে এসেছি তা আমার কাছে কখনও অস্বাভাবিক মনে হয়নি। কারণ যতক্ষণ মা জেগে থাকত ততক্ষণ তো আমি মায়ের গায়ে গায়ে থাকতাম, মায়ের পায়ে পায়ে চলতাম। কেউ আপত্তি করত না।

আমি ঠাম্মার কাছে লেপটে থাকতে চাইলে অনেক সময় শুনতে হত, যা মায়ের কাছে যা। মা কি তোকে কম আদর করে যে আমার কাছে ঘুরঘুর করছিস।

এক ছুটে চলে যেতে হত, মায়ের হাঁটু জড়িয়ে ধরতাম, মা হেসে কোলে তুলে নিত, আদরে আদরে আমাকে ডুবিয়ে দিত।

একটু বড় হতে একদিন দাদুর সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়েছি, ফুটপাথ ধরে হাঁটছি দাদুর পাশাপাশি, দেখি কি ফুটপাথে একটা মা, কাপড়টা ময়লা, কোলের কাছে ছেলেকে জড়িয়ে ধরে ঘুমোচ্ছে।

আমি হেসে বললাম, দেখো দাদু, ঠাম্মার কোলে কেমন শুয়ে ঘুমোচ্ছে।

দাদু বলল, ঠাম্মা নয় রে, ঠাম্মা নয়। ওটা ভিখিরি মা।

—ভিখিরি কি দাদু? আমি প্রশ্ন করলাম।

দাদু কি বুঝেয়েছিল জানি না, অনেক বড় হয়ে তবে বুঝেছি। সেদিন প্রশ্ন করলেও জানার ইচ্ছে ছিল না।

আমার মনের মধ্যে তখন দৃশ্যটা ঘুরছে। 'মায়ের কোলে ঘুমোচ্ছে'।

আমি তো যেভাবে শুয়েছি ঘুমিয়েছি সেটাকেই স্বাভাবিক মনে করেছি। আমার মাঝে মাঝে যে ইচ্ছে করত না তা নয়, কিন্তু ফুটপাথে ওই দৃশ্যটা দেখার পর মায়ের কোল ঘেঁষে শুয়ে ঘুমোতে বড়ই ইচ্ছে হল।

'তুমি তো অমুকে জন্মের থেকেই নিজের কাছে নিয়ে শোও', ঠাম্মাকে কে যেন বলেছিল।

ঠাম্মা জবাব দিয়েছিল, না গো, জন্মের থেকে নয়। যেই হামা দিতে শিখল ...

হেসে উঠে বলল, তা না করে কি উপায় আছে, খাট থেকে পড়ে গেলে তো জুই শুনতেই পাবে না।

একদিন ঠিক এই রকম একটা কাণ্ড ঘটেছিল বড়মাসি আমাদের বাড়িতে বেড়াতে এলে। দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর বড়মাসি তার মেয়েকে নিয়ে ঘুমিয়েছে। কী একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দ হতেই আমি ছুটে গেলাম, ঠাম্মা-দাদুও ছুটে গেল, মেয়ে পড়ে গেছে খাট থেকে, বড়মাসি ঘুমোচ্ছে।

সকলের চেঁচামেচি আর মেয়ের কান্নায় বড় মাসির ঘুম ভাঙল। ভীষণ লজ্জা পেয়েছিল।

বড়মাসিও তো মেয়েকে কাছে নিয়ে শোয়। তবে!

রাস্তার সেই ভিখিরি-মা আর বড়মাসিকে দেখে আমি একদিন জিদ ধরলাম, মায়ের কাছে শোব।

ঠাম্মা শেষ অবধি রাজি হল, দাদু বললো, অমু তো আর ছোটটি নেই।

—তবে যা।

সেদিন মায়ের যত না আনন্দ, তার চেয়ে আমার আনন্দ বেশি। এখন বুঝতে পারি মা সেদিন বোধহয় তার হারানো ছেলেকে ফিরে পেয়েছিল।

এক পাশে বাবা এক পাশে মা, বিছানার মধ্যিখানে আমি, সে যে কী পরম তৃপ্তি। তৃপ্তি দেখতে পেতাম বাবা-মা'র চোখেও। আমাকে তাদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে দাদু ও ঠাকুমা তাদের মাঝখানটিতে শোয়াত, ঘুম পাড়াত, আমি সেই ব্যবস্থাকেই স্বাভাবিক ভাবতে শিখেছিলাম বলে তফাতটা বুঝতে পারিনি।

মা ও বাবা প্রথম দিন থেকেই আমাকে এমন আদরে আদরে ডুবিয়ে দিতে শুরু করল, এখন বুঝতে পারি বাবা-মা'র মনে নিশ্চয় দাদু-ঠাকুমার বিরুদ্ধে একটা চাপা ক্ষোভ জমে ছিল।

আমি ওদের কাছ থেকে সরে এলাম মানেই যে দূরে সরে গেলাম তা কিন্তু নয়। বেশ কিছুটা বড় হওয়ার পর বুঝেছিলাম ওরা কোনও অন্যায় করেনি, অবিচার করেনি। বাবা-মা হয়তো বুঝতেই পারেনি কেন আমাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।

মানুষ তো জন্মের পর থেকেই অপরকে অনুকরণ করতে করতেই সব কিছু শেখে। তারপর তার নিজের বিচারবুদ্ধিমতো বড় হয়।

আমার মনে তখন কোনও অতৃপ্তি কোনও দুঃখ ছিল না। কিন্তু ক্ষোভ

ছিল। ক্ষোভ একটাই।

বাড়িতে আত্মীয়স্বজন কেউ এলে, কিংবা পাড়াপড়শি কেউ, বাবা-মা'র মধ্যে কোনও জড়তা দেখতাম না। কই, মনে তো পড়ে না কখনও আড়াল হয়ে যাবার চেষ্টা করেছে। কেন করবে, ওরা তো নিজেদের স্বাভাবিক বলেই মনে করত।

কিন্তু ওই যে আত্মীয়স্বজন বা পাড়াপড়শি, বাবা-মাকে দেখলেই, অথবা ওদের পরস্পরকে পরস্পরের সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই তাদের মুখেচোখে একটা বিচিত্র কৌতুকের হাসি জেগে উঠেই নিভে যেত। বেশ বুঝতে পারতাম ওরা হাসি চাপছে।

আমার ভীষণ অপমান লাগত, রাগ হত। অথচ কিছুই করার ছিল না।

আগেই বলেছি, মানুষ অনুকরণ করতে করতেই শেখে।

আমিও শিখেছিলাম।

বাবা-মা যখন পরস্পরের সঙ্গে কথা বলত, আমি বোঝার চেষ্টা করতাম। আর লক্ষ করতে করতে কখন থেকে যে ওদের ভাষাটা শিখে ফেলেছিলাম নিজেই জানি না। খুব ছোট বয়েসেই। আমিও সেই ভাষাতেই ওদের সঙ্গে কথা বলতাম।

আর বলতে পারতাম বলেই বাবা-মা কী খুশি। দাদু ঠাকুমাও।

ওদের জন্যে আমার মনের মধ্যে কি কোথাও কোনও লজ্জা ছিল! জানি না।

হয়তো ছিল, মনের মধ্যেই সেটা চাপা থাকত।

তা যদি না হবে, দাদু যখন আমাকে নিয়ে গিয়ে স্কুলে ভর্তি করে দিল, আমি যাই-আসি, নিত্য স্কুল করি, বন্ধুদের সঙ্গে খেলি, গল্প করি, কিন্তু কোনওদিন তাদের কাছে বাবা-মা'র কথা বলতে পারিনি কেন। বেশ মনে আছে আমি সেটা গোপন করতেই চাইতাম।

কয়েক ক্লাস ওপরে উঠেছি, দাদু খুব যত্ন করে পড়াতেন বলেই কিনা জানি না, কখনও ফার্স্ট হই কখনও সেকেন্ড, টিচাররা আমাকে খুবই ভালবাসতেন। ভালবাসাটা শুধুই ভাল ছাত্র বলে নাকি অন্য কারণে তা বুঝতে পারতাম না। আমাকে ভর্তি করার জন্যে দাদু যখন একা-একা গিয়ে হেডমাস্টারের সঙ্গে কথা বলে এসেছিল, তখন কী কথা হয়েছিল তা তো আমি জানি না। একটা সন্দেহ ছিল, দাদু হয়তো করুণা পাওয়ার লোভে বাবা-মার কথা বলে ফেলেছে।

ভর্তির দিনে হেডমাস্টার একটু বেশি বেশি আদর করলেন, পিঠে হাত রাখলেন, স্পর্শ থেকে বুঝলাম সেটা স্নেহের হাত। তিনি উঠে গিয়ে আর একজন মাস্টারমশাইকে ফিসফিস করে কীসব বলেছিলেন।

একটা সন্দেহ ছিলই টিচাররা সব বোধহয় জানেন, সেজন্যেই এত স্নেহ এত ভালবাসা। অথচ আমি তো স্নেহ ভালবাসা চাইছিলাম না। আমি শুধু গোপন করতে চাইতাম। ততদিনে শিখে গেছি এটা আমার লজ্জা।

ওপর ক্লাসে একজন খুব বন্ধু হয়ে গিয়েছিল। সে একদিন ছুটির পর বললো, চল তোর বাড়ি যাব। বাড়িটা চিনে আসি, ছুটির দিনে যেতে পারব।

আমি আতঙ্কে না না না না করে উঠলাম।

কি একটা অজুহাত দিয়েছিলাম আজ আর মনে নেই।

কোনওক্রমে তাকে নিরস্ত করতে পেরে শান্তি।

মনের মধ্যে একটা ক্ষোভ পুষে রেখেছিলাম বলেই দুম করে একদিন ঠাকুমাকে বলে বসলাম, ঠাম্মা, বাবা-মা ওরকম কী করে হল?

ঠাকুমা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল, মুখের দিকে তাকিয়ে দেখি চোখের মধ্যে ভেজা-ভেজা ভাব।

ঠাকুমা কি কষ্ট পেল?

ঠাকুমা অনেকক্ষণ পরে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, সে দুঃখের দিনের কথা তোকে দাদু কি আর বলব!

একটু থেমে, জন্ম থেকেই। কত ডাক্তারবদ্যি যে করেছি...

পরক্ষণে সবাই বলে দিল কিছু করার নেই।

আমি তখন সব জানতে চাই, বুঝতে চাই। ওসব কথা তুলে যে ঠাকুমাকে কষ্ট দেওয়া হচ্ছে ভাবতেই পারিনি।

ঠাকুমা হঠাৎ হাসার চেষ্টা করল, তুই যখন এলি সংসারে সুখ-আনন্দ ফিরে এল। বলে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

তারপর ফিসফিস করে যেন নিজেকেই বলল, তুই কথা বলতে শুরু করলি ... যেদিন প্রথম একটা শব্দ উচ্চারণ করলি...

ঠাকুমা'র একটাও দাঁত পড়ে যায়নি তখনও, একটা দাঁত ছিল একটু উঁচুনীচু, তার হাসিটা আমার খুবই ভাল লাগত।

হেসে উঠে বলল, সবাই তো প্রথমে মা বলে, দু'-একজন বাবাও বলতে পারে, ও দুটোই তো শেখানো হয়...

কথার সঙ্গে হেসে আমাকে জড়িয়ে ধরে। —তোকে তো আমি দাদু বলতে শেখাচ্ছিলাম। বাবা কি মা বলতে শিখিয়ে লাভ কী বল! ... দাদু তো বলতে পারলি না, হঠাৎ বলে উঠলি দাদা। দাদু তো বলতে পারলি না, তাই দাদা। সে যে কি আনন্দ, আমি চিৎকার করে তোর দাদুকে ডাকলাম, ও ছুটে এলো ... তারপর ওর সামনে বারবার বলছি বল দা-দা, বল দা-দা, আর তুই এক নাগাড়ে বলে চলেছিস দাদা দাদা তা দেখে তোর দাদুও ফুর্তিতে হাসছে। সেদিনই হয়তো প্রথম খুব নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিলাম, দু'জনেই।

দাদু কাছেই হাতের খবরের কাগজ নিয়ে পড়ার ভান করছিল, আমি তো ভাবছিলাম ঠাকুমার কথা কানেই যাচ্ছে না।

হঠাৎ হেসে উঠল, সেদিনই বুঝলি অমু, আমাদের এই বাড়িতে সুখ ফিরে এল।

দাদু হাসলে সামনের একটা ফোকলা দাঁত দেখা যেত। তাতে হাসিটা আরও মজার লাগত।

ঠাকুমার একটাও দাঁত পড়েনি বলে মাঝে মাঝেই খোঁটা দিত। ওই দাঁতটা গিয়ে বাঁধিয়ে নিয়ে এলেই তো পারো।

দাদু একবার উত্তর দিয়েছিল, তা হলেই কি বয়েসটা কমে যাবে? তুমি তো চাও আমার বয়েসটা কমে যাক, তাই না?

তা শুনে ঠাকুমার কী রাগ! চোখে, চোখের ভুরুতে।

পরিবেশ হাল্কা করার জন্যে দাদু বলল, পমেটম করে বয়েস কমিয়ে কোনও লাভ নেই গো, চুলে কলপ দিলেও অফিসের খাতায় রিটায়ারমেন্টের তারিখ বাঁধা।

আমি জানতাম দাদু খুব বড় চাকরি করে। কী চাকরি, কোথায় চাকরি কিছুই জানতাম না। জানার ইচ্ছেও হয়নি। শুট-টুট পরে যখন গলায় শার্টের ফলস্ কলার লাগাত, কোনও কোনওদিন ঠাকুমাই আগে থেকে লাগিয়ে রাখত, দাদু তারপর সুন্দর একটা টাই গলায় পরত। আমি অনেকদিন অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখেছি। কৌশলটুকু শিখে নেবার ইচ্ছেও হত, তা হলে একটা টুলে দাঁড়িয়ে আমি দাদুর গলায় টাইটা বেঁধে দিতে পারব।

কী চটপট কী এক কায়দায় ওটা বাঁধা হয়ে যেত।

তারপরই দাদুকে মনে হত অন্য এক মানুষ। সাহেব সাহেব।

আমি একদিন ঠাকুমাকে বলেছিলাম, তুমি শিখে নাওনি কেন, বেঁধে দিতে পারতে।

ঠাকুমা বললো, ও ছাইপাঁশ আমার দ্বারা হবে না রে, বলে না, যার কাজ তারেই সাজে, অন্যজনে লাঠি বাজে।

না, ঠাকুমা গ্রাম্য ধরনের মানুষ ছিলেন না। তবু কথার ফাঁকে মাঝে মাঝে এ ধরনের দু'-একটা ছড়া কাটতেন।

আমার বেশ মজা লাগত শুনতে। একবার বোধহয় একটু দুঃখ হয়েছিল, এ-কথা ভেবে যে বাবা-মা কেউই এই মজা পাচ্ছে না।

দাদুর কথাটাই বলি। দাদু স্যুট টাই পরলে একেবারে সাহেব, কিন্তু বাড়িতে টুইলের শার্ট আর ধুতি। একেবারে ঘরোয়া চেহারা। কথাবার্তাও। কী করে একজন লোক দু'রকম হয়, দেখে আশ্চর্য লাগত। একবার দাদুর অসুখ করেছে, অফিস যায়নি, অফিসের এক বন্ধু, বন্ধুটন্ধুই হবে হয়তো, বাড়িতে এল, হাতে ফাইল। অফিসের কোনও কাজের কথাও হতে পারে। দু'জনে কি ফটাফট ইংরেজি বলে যাচ্ছে। এই দাদুটা আমার অচেনা। আমি দরজার আড়াল থেকে শুনে কিছু বুঝতে পারিনি। কেউ বাইরে থেকে এলে ঘরে ঢোকাও নিষেধ ছিল। নিষেধ জানিয়েছিল বাবা-মা। ওদের ভাষায়। হাতের ভঙ্গি আঙুলের মুদ্রায়।

কীভাবে জানি না, শুধু বাবা-মাকে জন্মের পর থেকে দেখে দেখে, ওরা যখন নিজেদের মধ্যে কথা বলত তার মানে বোঝার চেষ্টা করতে করতে আমি দিব্যি ওভাবে বাবা-মা'র সঙ্গে কথা বলতাম। ওরা বুঝতেও পারত, উত্তরও দিত। আমার কোথাও কোনও অসুবিধে হচ্ছে বলে মনে হত না।

দাদুকে সাহেব সাহেব মনে হত কারণ দাদুর গায়ের রং ছিল খুব ফর্সা। ঠাকুমারও। বাবা-মাও কম ফর্সা নয়। মাকে তো আমার রীতিমতো সুন্দরী মনে হয়। কী জানি, হয়তো সব ছেলেরই মাকে সুন্দর মনে হয়। কিন্তু না, মা সত্যি সত্যি সুন্দর। মনে আছে, আমাদের কী রকম যেন একটু দুর সম্পর্কের আত্মীয়, বাইরে থাকে, এসেছিল। এবং মাকে দেখে কী উচ্ছ্বাস। ঠাকুমাকে বলে উঠেছিল, 'ও মা, আপনার ছেলের বউ তো অদ্ভুত সুন্দরী।'

অদ্ভুত আবার সুন্দরী হয় নাকি' কী ধরনের যে কথা সব লোকে বলে। তা বলুক, আমার শুনে কিন্তু খুবই ভাল লেগেছিল। একটু যে বুকের ভেতরে গর্ব অনুভব করিনি তাও নয়।

ফর্সাদের তো সবাই ভালবাসে, পছন্দ করে।

ঠাকুমা খুশি হয়েই বিষণ্ণ গলা এনে বলল, হলে কি হবে, ওরও ভাগ্য দেখো, এমন চেহারা, কিন্তু আমার সুশানের মতোই।

বাবার নাম সুশান্ত, তা থেকে সুশান।

আমি তো অতশত বুঝিনি, বুঝি না, বাবা-মা সুড়সুড় করে এসে তাকে প্রণাম করতেই আমিও ঝট করে প্রণাম করে নিয়েছি, তারপর উনি কে, কে হন জানার জন্যে মাকে হাতের আর আঙুলের ভাষায় সেই প্রশ্নটা করে বসেছি।

মা তার ভাষায় কী বলছে সেদিকে আর চোখ গেল না, তার আগেই সেই ভদ্রমহিলা হো হো করে হেসে উঠেছে।

আসলে হয়েছে কি, আমি তার আগে তাঁর সঙ্গে দু'-একটা কথা বলেছি। তারপর মা'র সঙ্গে হাত নেড়ে কথা বলছি দেখেই হেসে উঠেছেন।

হাসার কী আছে, যার যা ভাষা তার সঙ্গে তো সেই ভাষাতেই কথা বলতে হয়।

হেসে ওঠা অন্যায় হয়েছে ভেবেই কি না কে জানে, উনি স্নেহ মাখানো মমতা দেখানোর ভঙ্গিতে বলে বসলেন, আহা, বউও বুবি?

কেউ যেন আমাকে চাবুক মারল। আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি, বিচ্ছিরি, তুমি একদম বিচ্ছিরি। বলেই ঘর থেকে ছুটে পালালাম।

আসলে বলছিলাম দাদুর কথা। স্যুট পরা টাই বাঁধা পোশাকেই দাদু আমাকে একটা ভাল ইংরেজি স্কুলে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে দিয়েছিল। নিজের মনকে স্তোক দিয়েছি, দাদুর ওই চেহারা দেখেই, কিংবা দাদু কী বড় চাকরি করে সেটা জেনেই আমাকে স্কুলে ভর্তি করে নিয়েছিল। তার আগে আমিও জেনে গিয়েছিলাম ভাল স্কুলে ভর্তি হওয়া খুব কঠিন। তা হলে এত চটপট হল কেন। মনের গোপনে, একটা ভয়, একটা দুশ্চিন্তা ছিলই। বাবা-মার কথা বলে দাদু করুণা প্রার্থনা করেনি তো!

প্রথম প্রথম কেবলই ভয় হত টিচাররা কেউ হয়তো ক্লাসের মধ্যেই বলে বসবে, তোমার বাবা-মা তো ডেফ অ্যান্ড ডাম, কে পড়ায় তোমাকে?

কেবলই ভয় বন্ধুরাও জেনে যাবে।

একটাই রক্ষে ছিল, আমাদের পাড়ায় আমার স্কুলের বন্ধু কেউ ছিল না। স্কুলের কেউ বাড়িতে আসতে চাইলে কোনও না কোনও অজুহাত দেখিয়ে তাদের নিরস্ত করতাম।

আমার গোপন লজ্জার কথা হয়তো পাড়ার বন্ধুরা সবাই জানত, খুব কম বয়েস থেকেই তো তাদের সঙ্গে খেলাধুলো করে এসেছি। তখন একটুও লজ্জা পেতাম না। এটা যে লজ্জা পাওয়ার কোনও বিষয় তা তখন মনেই হত না। ওরা কেউ মা-বাবাকে দেখে হাসতও না। কখনও কখনও দু'একজন আমার সঙ্গে আমাদের বাড়িতেও এসেছে। ছাদে কি বারান্দায় খেলা করেছি। এর মধ্যে যে লজ্জা পাওয়ার কিছু আছে কেউ ভাবত না,

আমিও না। পরে একটু একটু করে বয়স্কদের ব্যবহার আর চাপা হাসি আমাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল এর মধ্যে লজ্জা পাওয়ার কিছু আছে, গোপন করতে হয়।

একটা বেশ নামি ভাল স্কুলে ভর্তি হওয়ার ফলে আমার কাছ থেকে পাড়ার বন্ধুরা দূরে সরে গেল। নিজেকে তো বিচার করা যায় না, আমি নিজেই সরে এসেছিলাম কিনা তাই বা কে জানে।

একটু অস্বস্তি, একটু লজ্জা ছিল ঠিকই, কিন্তু বাবা মা'র জন্যে আমার গর্বও কম ছিল না। গর্ব বেড়ে গিয়েছিল ওপরের ক্লাশে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে। অথচ সেই গর্বের কথা, বাবা-মা'র কৃতিত্বের কথা কাউকে বলার উপায় নেই। কারণ সে-কথা বলতে গেলেই লজ্জায় পড়তে হবে।

দাদু-ঠাকুমার কিন্তু একটুও অস্বস্তি ছিল না। বাবা-মা'র নিজেদের তো নয়ই।

স্কুলের পাঠ্যবইয়ে যদি কখনও ডেফ অ্যান্ড ডাম শব্দটা এসে যেত, টিচার মানে বুঝিয়ে দিতেন সারা ক্লাশকে। আমার সারা শরীর যেন কেমন করে উঠত, মনের মধ্যেও, আমি মাথা নীচু করে শুনে যেতাম। কেমন একটা আশঙ্কা, আতঙ্কই বলা যায়, এই বুঝি টিচার আমার দিকে তাকান, বলে বসেন, অমৃতর বাবা-মা ডেফ অ্যান্ড ডাম।

দাদু-ঠাকুমা আমার মতো বাবা-মা'র ভাষায় কথা বলতে পারত না, কিন্তু ইঙ্গিতে ইশারায় সবই বোঝাতে পারত। প্রশ্ন করতেও পারত। ওরাও দিব্যি ইঙ্গিতে ইশারায় জবাব দিত।

সবচেয়ে অবাক হয়েছিল, হয়তো যারাই দেখেছে, অবাক হয়েছে, বাবাকে মাকে খবরের কাগজ পড়তে দেখে।

দাদুর পড়া হয়ে গেলেই বাবা এসে কাগজটা নিজের ঘরে নিয়ে যেত। বেশ মন দিয়ে পড়ত, মজার কিছু পড়লে হেসে উঠত, সঙ্গে সঙ্গে উঠে এসে মায়ের হাত ধরে নিয়ে গিয়ে আঙুল দেখিয়ে মাকেও সেই জায়গাটা পড়তে বলত। পড়ে মাও হাসত।

একবার একজন বুড়ো মতো লোক, ওই দূর সম্পর্কের কোনও আত্মীয়-টাত্মীয় হবে বোধ হয়, আমার ওসব জানতেও ইচ্ছে করত না, বাবাকে খবরের কাগজ পড়তে দেখে অবাক হয়ে বলে উঠল, সে কি সুশান পড়তে পারে?

দাদু বলে উঠল, বেশ গম্ভীর অপ্রসন্ন গলায়, বলল, শুধু সুশান নয়, আমার বউমাও।

তারপর একটা ডেফ অ্যান্ড ডাম স্কুলের নাম করল। ওরা দু'জনেই ওই স্কুলে পড়াশুনো করেছে।

বাবা কাগজ নামিয়ে রেখে বুড়ো লোকটাকে দেখছিল। বাবাকে পড়তে দেখে ভদ্রলোক যে অবাক হয়েছে তা বোধহয় বুঝতে পারল। কথা তো কিছুই কানে যাচ্ছিল না, কিন্তু ভাবভঙ্গি দেখে বোধহয় বুঝতে পারল।

আমাকে হাত নেড়ে আঙুলের মুদ্রায় জিগ্যেস করল, কি বলছে লোকটা?

আমি বুঝিয়ে দিলাম।

আর আমিও ঠিক সে-ভাবেই বাবার কথার উত্তর দিচ্ছি দেখে বুড়ো লোকটা হেসে উঠল। গুরুজন হোক আর যাই হোক ওকে বুড়ো লোকটা বলতেই ইচ্ছে করছে।

আমি যে কথা বলতে পারি তা তো আগেই দেখেছে, সে জন্যেই হাসি। আসলে দরজার ঘন্টি শুনে আমিই দরজা খুলে তাকে ডেকে এনে বসার ঘরে বসিয়েছি। বলেছি, বসুন, দাদুকে ডেকে দিচ্ছি।

বাবাকে বুঝিয়ে দিলাম, লোকটা জিগ্যেস করছে বাবা পড়তে পারে কিনা, দেখে অবাক হয়ে গেছে লোকটা।

বাবার মুখে হাসি ফুটে উঠল।

লোকটাকে দেখে চট করে উঠে দাঁড়িয়েছিল বাবা, এবার নির্মল হাসি দেখা দিল মুখে, এগিয়ে গিয়ে বুড়ো লোকটার হাত ধরে নিজের ঘরে টেনে নিয়ে গেল।

একটা আলমারি বইয়ে ঠাসা।

বুড়ো লোকটাকে ইশারায় বইগুলো দেখিয়ে, দু'একখানা বই টেনে বের করেও দেখাল।

মা সেই সময় ঘরে ঢুকে বুড়ো লোকটাকে প্রণাম করল, আর মা উঠে দাঁড়াতেই বাবা তাকে বোঝাতে চাইল যে, মাও পড়তে জানে। লিখতেও।

লোকটাকে আমার একটুও পছন্দ হচ্ছিল না। তাই বুঝতে পারবে কি পারবে না ভেবে আমিই বললাম, বাবা-মা দু'জনেই পড়তেও পারে, লিখতেও পারে। ওই তো সব বই পড়েছে ওরা; দু'জনেই।

মুখে চোখে বিস্ময় নিয়ে দাদুর ঘরে ফিরে গেল লোকটা। মুখে একটাই কথা, হাউ ইজ ইট পসিবল।

দাদু হেসে বলল, আমিও তো ভাবিনি, ওখানে ভর্তি করার আগে। দাদু ইংরিজির ছাত্র ছিল বোধহয়। বুড়ো লোকটার মুখে ইংরিজি শুনে দাদু আউড়ে গেল, দেয়ার আর মোর থিংস ইন দিস হেভেন অ্যান্ড আর্থ, হোরেশিও...

দাদু কখনও বাড়িতে ইংরিজি বলত না। সেদিনই শুনেছিলাম। না, এখনও কথাটা মনে আছে তা নয়, বড় হয়ে পড়তে গিয়ে পেয়েছিলাম, শেষটা—দ্যান ইওর লিটল ফিলজফি ক্যান থিঙ্ক অফ। গায়ে কাঁটা দিয়েছিল, মনে পড়ে গিয়েছিল দাদুর মুখের কথাটা। এখন তো জেনে গেছি পৃথিবীতে অবাক হবার মতো কিছুই নেই। পৃথিবীর যেখানে যত বিস্ময় আছে, বিজ্ঞান একে একে সেগুলোকে একদিন অতি সাধারণ স্বাভাবিক করে দেবে।

ইঙ্গিতে ইশারায় বোঝাতে না পারলে দাদু বাবাকে প্রশ্নটা লিখে দিত, বাবাও লিখে উত্তর দিত। মায়ের বেলাও তাই।

সেই বুড়ো লোকটা অবাক হয়েছিল। আর আমার কাছে এটাই তো সবচেয়ে গর্বের ব্যাপার। চিৎকার করে সবাইকে বলতে ইচ্ছে করে। অথচ বলতে পারি না।

ও-কথা বললেই তো সবাই জেনে যাবে। অথচ গোপন রাখাও যে কী কঠিন কাজ।

এক এক সময় মনে হত একেবারে ছেলেবেলা থেকেই যদি সবাইকে বলে দিতাম, গোপন না রেখে প্রকাশ করে দিতাম, তাহলে কী আর অসুবিধে হত। হয়তো একটু কৌতুকের হাসি সহ্য করতে হত, হয়তো বন্ধুরা কেউ উপহাস করত, কী এমন ক্ষতি হত, সেটুকু নয় সহ্য করেই নিতাম।

তার পরই মনে হয়েছে, না বলে ভালই করেছি, বাবা-মা তাহলে ওদের কাছে ছোট হয়ে যেত।

বাবা-মা'র জন্যে গর্ব হওয়ার আরও অনেক কারণ ছিল, তা সত্ত্বেও কোথাও একটা সঙ্কোচ আর অস্বস্তি আমাকে ভেতরে ভেতরে ছোট করে রেখেছিল। লেখাপড়া, খেলাধুলো আড্ডার মধ্যে ভুলেই থাকতাম, কিন্তু কখনও কখনও ক্ষেত্র বিশেষে যখনই সচেতন হতে হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতরের মানুষটা মাথা নীচু করে ফেলেছে। নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করেছি, আমি মানুষটা কী খুব ক্ষুদ্র। এটা সকলের কাছে প্রকাশ করে দিলে ক্ষতি কী?

কই দাদু-ঠাকুমা তো কোনও সঙ্কোচ বা অস্বস্তি বোধ করে না।

একটা নির্দেশ ছিল, অফিসের কোনও লোক এলে দাদু যখন তার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন তখন যেন কেউ সেখানে না যায়।

আমার ধারণা ছিল তাদের কাছ থেকে বাবাকে-মাকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যেই। পরে বুঝতে পারলাম তা নয়। আসলে ওদের কথাবার্তায় হয়তো কোনও গোপনীয়তা থাকত, সেজন্যেই।

কারণ, একসময় ঠাকুমা গিয়ে ওদের চা দিয়ে আসতে, নয় সিঙ্গাড়ার প্লেট, কী মিষ্টি। কিছু না থাকলে মাকে ইশারায় বুঝিয়ে দিত, মা চটপট গ্যাসের স্টোভ জ্বালিয়ে একটা ডবল ডিমের অমলেট করে নিজেই দিয়ে আসত।

দরজার আড়াল থেকে একবার দেখেছিলাম, আগন্তুক ব্যক্তিটি সাদা ফর্সা হাতে বাড়ানো প্লেটের দিকে তাকিয়েই চোখ তুলে মায়ের দিকে তাকাল, সেই চোখেমুখে বিস্ময় আর খুশি ভাব, মুখে কী বলল শুনতে পেলাম না, নিঃসংশয়ে সেটা প্রশংসা।

কিসের প্রশংসা, উনি তখনও অমলেট খাননি, নিশ্চয়ই মাকে দেখে।

মায়ের রান্নার হাত খুব ভাল। রান্নার একটা লোক ছিল, কাঞ্চনের মা, সে দু'বেলা এসে রান্না করে দিয়ে যেত। খাবার সময় ঠাকুমা গরম করে দিত। কিন্তু কোনও-কোনওদিন, মা এক ফাঁকে দু'একটা পদ নিজেই রান্না করত। সেদিন মনে হত মায়ের হাতের রান্নার স্বাদই আলাদা। বোধহয় ঠাকুমাই শিখিয়েছিল। একটা অসুবিধে ছিল। মাংস রান্নার সময় প্রেশার কুকারের সিটি মা শুনতে পেত না বলে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকত, মাথার দিকে বাষ্প তুবড়ির মতো ফেটে বেরোতেই বুঝতে পারত। কোনও কোনওদিন ঠাকুমা কাজ করতে করতে সিটি শুনেই ছুটে গিয়ে মাকে ইশারায় নামাতে বা সুইচ কমিয়ে দিতে বলত।

মা আমার চোখেই নয়, সকলের চোখেই খুব সুন্দর ছিল। সেজন্যেই হয়তো দাদুর অফিসের সেই লোকটির চোখে সপ্রশংস দৃষ্টির পরেই কিছুটা বিষণ্ণতা দেখেছিলাম।

কী আশ্চর্য, মানুষের বড় অদ্ভুত স্বভাব। দেখতে সুন্দর হলে তার জীবনের যে-কোনও খামতির জন্যে মায়া মমতা যেন বেড়ে যায়। যারা কুৎসিত দুঃখ-কষ্ট তো তাদেরও একই, কই তাদের জন্যে তো সমবেদনা উথলে ওঠে না।

করুণা বিতরণ করার সময়েও এমন শ্রেণীবিভাগ করে ফেলা কেন! আর তোমার করুণা পাওয়ার জন্যেও তো সে লালায়িত নয়। সে নিজের পায়ে দাঁড়িয়েই সোজা হয়ে হাঁটে, মাথা নীচু করে না।

এই সময় একদিন একটা নেমন্তন্ন এল।

দাদুর অফিসেরই খুব বন্ধু হবে হয়তো। হাতে বিয়ের কার্ড এক তাড়া।

স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই দাদু-ঠাকুমার চেয়ে বয়েসে অনেক ছোট।

ভদ্রলোক আগেও কয়েকবার এসেছেন, ওঁকে চিনি। অমূল্যবাবু।

বেশিক্ষণ বসেননি, বাড়িতে আর তো কিছুই ছিল না, ছিল শুধু রসগোল্লা। দু'প্লেটে দুটো করে রসগোল্লা দেওয়া হল, ওঁরা একটা করে খেলেন।

ওঁদের মতোই দাদু-ঠাকুমাও খুব হাসিখুশি, কারণ ওঁদের এক মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্ন। দেখেছি মেয়ের বিয়ে হলে ছেলের বিয়ের চেয়েও বেশি আনন্দ হয় সকলের।

সেটা রবিবার, বাবা কাজে বেরোয়নি।

অমূল্যবাবু ও তাঁর স্ত্রী উঠে এসে ঠাকুমাকে হাসতে হাসতে বললেন, সকলের যাওয়া চাই কিন্তু.

আমার কাঁধে হাত রেখে, একেও নিয়ে যাবেন।

তারপর বললেন, ওদের ডাকুন, নিজে বলে যাই।

ঠাকুমা বলল, যাবে যাবে।

বলে হাসতে হাসতে আমাকে বলল, যা ডেকে নিয়ে আয়।

অন্য সকলেই যেমন নাম ধরে ডাকলেই তারা চলে আসে, ওই একটা বড় অসুবিধে।

বিয়ের নেমন্তন্ন শুনে আমারও খুব আনন্দ হচ্ছিল। দেখতে বেশ মজা লাগে।

ছুটে গিয়ে হাত আর আঙুলের ভাষায় ওদের আসতে বললাম। আমি তো ওদের ভাষা জানি। জানালাম, বিয়ের নেমন্তন্ন।

মায়ের মুখও খুব উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

বাবা-মা দু'জনেই এসে দাঁড়াল, হাসিমুখে।

ভদ্রমহিলাই বললেন, তোমরাও যাবে কিন্তু।

দু'জনেই ঘাড় নাড়ল।

ঠাকুমা বলল, যাবে যাবে।

ঠোঁট নাড়া দেখেও কিছু কিছু কথা ওরা বুঝতে পারে কিনা কে জানে, কোনওদিন জিগ্যেস করিনি। তাছাড়া আমি তো আগেই বুঝিয়ে দিয়েছি, বিয়ের নেমন্তন্ন।

মা কেন যে এত খুশি হয়ে উঠত বুঝতে পারতাম। মায়ের তো যা কিছু কথাবার্তা বাড়ির মধ্যে। গল্পগুজব করার, হাসিফূর্তির বলতে গেলে কোনও উপায়ই ছিল না। আর ওদের তো কোনও সঙ্কোচ ছিল না।

দাদু একদিন বুঝিয়েছিল, ওরা তো জানে ওরা নর্মাল মানুষ। যার একটা হাত নেই কী পা নেই সে কী নিজেকে অন্য কিছু ভাবে। বরং অন্য লোকগুলোই একটু অ্যাবনর্মাল।

ছোটমামা তো একটু আধটু রাজনীতির কথা বলত, কোনও পার্টিতে ছিল না, কিন্তু তার কথায় মাঝে মাঝে রাজনীতির ধাঁচ এসে পড়ত।

দাদু কথাগুলো বোধহয় ছোটমামাকেই বলেছিল, আমাকে নয়।

ছোটমামা বলল, কথায় বেশ কিছুটা ঝাঁঝ, আমাদের এই পোড়া দেশে শতকরা আশি-ভাগ লোকই তো ডেফ অ্যান্ড ডাম্ব। কই তাদের তো কেউ অস্বাভাবিক ভাবে না। বরং তাদের এতই স্বাভাবিক ভাবে যে তাদের দিকে কারও চোখই যায় না।

দাদু তার রাগ দেখে হেসে ফেলল। সাধে কী আর তাকে ঠাট্টা করে অ্যাংরি ইয়াং ম্যান বলত।

ঠাকুমা ছোটমামাকে বেশ পছন্দ করত। বলত, বেশ জোয়ান জোয়ান কথাবার্তা ওর, ভালই লাগে। তোমার মতো মিনমিনে নয়। কথাটা দাদুর উদ্দেশে।

একটা জিনিস বেশ ভাল লাগত আমার।

ছোটমামা এলেই মা আর তার কাছ ছাড়া হতে চাইত না। তখনই রান্নাঘরে ছুটছে, ঠাকুমার নির্দেশ মেনে টুকটাক কাজ করছে, আবার সুযোগ পেলেই ছোটমামার কাছে এসে দাঁড়াচ্ছে। মুখে তৃপ্তির আবেশ।

শুধু ছোটমামা কেন, মামার বাড়ি থেকে যে-কেউ যখনই আসত, মায়ের মুখে-চেহারায় হাঁটা-চলায় একটা বাড়তি খুশির ভাব দেখতে পেতাম।

আমাকে সঙ্গে নিয়ে মা যখনই বাপের বাড়ি যেত, চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে পা ফেলতে না ফেলতে মা একেবারে অন্য মানুষ। বরং বাবার মধ্যেই একটু জড়তা দেখা দিত। মা তখন কী চঞ্চল, কী হুটোপাটি। যেন বাচ্চা বয়সের কোনও মেয়ে। পড়শিদের কেউ কেউ আসত। হাসিহল্লা। অবশ্য হল্লাটা তাদেরই। মায়ের কানে যেত না, কিন্তু বোধহয় বুঝতে ঠিকই পারত।

একজন কেউ সাপ লুডো টেনে নিয়ে এসে টেনে টেনে সবাইকে বসাত। মা তো আগেভাগেই বসে যেত।

বাবা ওখানে গেলেই কেমন একা একা।

ওটা তো মায়ের বাপের বাড়ি। ওখানে গেলেই মা যেন নিজেকে পুরোপুরি স্বাধীন মন করত। যখন যা খুশি করছে, যে ঘরে ইচ্ছে ঢুকে পড়ছে, বয়াম খুলে আমের আচার বের করে চাটছে।

আমাদের বাড়িতেও কোথাও কোনও ঘেরাটোপ নেই, বাধানিষেধ নেই, মায়ের যে-কোনও কাজই সবাই মেনে নিচ্ছে, একটু প্রশ্রয়ই ছিল বলা যায়, তবু মাকে দেখে মনে হত কেমন নিজেই নিজেকে সংযত করে চলে।

ওরা লুডো খেলতে বসেছে তিনজন, আমাকে কে যেন টেনে বসাতে চাইল, মা তাকে হাতের ইশারায় থামিয়ে দিল।

বাবা খাটের বাজু ধরে হাসি মুখে ওদের কাণ্ড কারখানা দেখছিল, মা ঝট করে উঠে এসে বাবার হাত ধরে জোর করে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর ঘুমনোর নাম নেই, সারা দুপুর লুডো খেলে কাটিয়ে দিয়েছে।

দিদা এসে ধমক দিয়েছে, ধমক তো মা শুনতে পায়নি, মুখচোখের ভাবে বুঝতে পেরেছে, তবু অন্যদের ইশারায় বলেছে, খেল খেল, ওর কথায় কান দিস না। কান দিস না, এ-কথা নিশ্চয় বলতে চায়নি, হয়তো চোখ আর ভুরুর ধমকটাকে উপেক্ষা করতে বলেছে।

একটাই ব্যাপার আমার খুব চোখে পড়ত। আমাদের বাড়িতে মা কিন্তু বাবার দিকে এতখানি দৃষ্টি দিত না। আর ওখানে যখনই গিয়েছি, সবকিছুর মধ্যে মায়ের দৃষ্টি বাবার যত্নআত্তির দিকে।

বাবা কী খেতে ভালবাসে, কী কী রান্না করতে হবে, কতখানি ঝাল দিতে হবে, দিদাকে কিংবা মামীমাকে গিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে আসছে।

দিদা কিংবা মামীমা হাতের ইশারায় বলছে, থাম থাম, তোকে আর ওস্তাদি করতে হবে না। আমরা সব জানি।

হাতের ইশারার সঙ্গে সঙ্গে কথাগুলোও বলে ফেলত। যদিও জানত ওগুলো শুধু আমারই কানে যাচ্ছে।

বাবার আদর আপ্যায়নে ওদের বেশ একটু তটস্থই লাগত।

বড় হয়ে বুঝেছি, একেই বোধহয় জামাই-আদর বলে।

কোত্থেকে কোথায় চলে যাচ্ছি, আমার কী আর হিসেবের ঠিক আছে। আপনি লেখক মানুষ। যেখানে যেমন দরকার গুছিয়ে নেবেন। আমি তো শুধু আমার জীবনের কথাগুলো লিখে যাচ্ছি।

বাপের বাড়িতে গেলে মা আমার একটু বেশি বেশি আনন্দ পেত এটা ঠিক। কিন্তু ঠাকুমা আর দাদুও মাকে আর এক ধরনের ভালবাসত। সেটাও দিব্যি টের পেতাম।

সেই যে বলছিলাম দাদুর কোনও অফিসের বন্ধুর মেয়ের বিয়ের নেমন্তন্নর কথা। সেই ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা বাবার আর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, তোমরাও যাবে কিন্তু, আর কথা শুনতে না পেলেও ওদের বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

বাবা-মা দু'জনেই ঘাড় নেড়ে সায় দিয়েছিল।

এই একটা অস্বস্তি আমার হত, যারা বলত বোধহয় তাদেরও।

সব জেনেশুনেও ইশারা করে কিছু বোঝাতে গিয়ে মুখ ফুটে কথাগুলোও বলে ফেলত। অভ্যাসের ফলেই। যদিও জানত কথাগুলো ওদের কাছে কিছুই পৌঁছে দিচ্ছে না। একটা লাভ হত, কখনও মুখ দেখে যদি মনে হত ওরা বুঝতে পারছে না, তখন আমি হাত আর আঙুলের ইশারায় বুঝিয়ে দিতাম।

শেষ অবধি সেই বিয়ের দিনটা এল।

ঠাকুমা ক্যালেন্ডারে তারিখটায় দাগ দিয়ে রেখেছিল, নেমন্তন্নর কার্ডটাও যত্ন করে তুলে রেখেছিল।

দু'দিন আগেই দাদুকে মনে করিয়ে দিয়েছিল।

দাদুকে অফিসের গাড়ি এসে নিয়ে যেত, ফিরিয়ে দিয়ে যেত।

বিয়েটিয়ে থাকলে ড্রাইভারকে বলে রাখত। বোধহয় কিছু বখশিস দিত, লোকটা রাত অবধি থেকে বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরিয়ে দিয়ে যেত।

ওদের নিয়ে দাদুর শেষ অবধি কোনও অস্বস্তিই ছিল না, সকলকেই বলে দিতে পেরেছিল। অথচ আমার অস্বস্তি কিছুতেই যাচ্ছিল না। চেষ্টা করে কেবলই গোপন করে গেছি। স্কুলের বন্ধুদের কাউকেই বলতে পারিনি। এমন কী তারা আসতে চাইলে এড়িয়ে গিয়েছি। ওরা সবাই দূরে দূরে থাকত বলেই সেটা সম্ভব হয়েছিল।

বিয়ে বাড়ি যাওয়ার দিনে বুঝতে পারলাম ঠাকুমা মাকে কতখানি ভালবাসে।

দাদু অনেক আগে থেকেই ঠাকুমাকে সাজগোজ করার জন্যে তাড়া দিতে শুরু করেছিল।

ঠাকুমা সান্ত্বনা দিচ্ছিল, হবে হবে, এখন থেকে ওইসব কাপড়চোপড় পরে বসে বসে ঘামব নাকি।

দাদু সুযোগ পেলেই ঠাট্টার ছলে ঠাকুমাকে খোঁটা দিত। বলে বসল, তোমার কথা বলছি না, তুমি আর বুড়ো বয়েসে কী সাজগোজ করবে?

ঠাকুমা ফুঁসে উঠল, সাজব না মানে? এত যে সব শাড়ি কিনে এনেছি, বাবা এতসব গয়না দিয়েছিল, জীবনে কবার পরার সুযোগ পেয়েছি?

দাদু ফোড়ন কাটল, শুধু তোমার বাবার দেওয়া গয়নার কথাই মনে আছে? আমি যেগুলো দিয়েছি সেগুলো বুঝি কিছুই নয়?

ঠাকুমা বলল, সে সব তো কান্নাকাটি করে আদায় করা, দিয়েছো আবার কবে।

আমি সামনে ছিলাম, শুনছি আর হাসছি।

ঠাকুমা আমাকে দেখতে পেয়েই বলে উঠল, সব বড় বড় কথা ওর, কিন্তু বিশ্বাস করিস না অমু।

দাদু অপ্রসন্ন মুখ করে, সবটাই ভান, বলল, হ্যাঁ এবার ওই নাতিটাকেও বিগড়ে দাও আমার বিরুদ্ধে।

দু'জনের কপট ঝগড়া দেখে আমি তখন হা হা করে হাসছি।

ঠাকুমা আসল কথাটা কিন্তু মিথ্যে বলেনি। সত্যিই তো ওরা জীবনে ক'বারই বা সাজগোজ করার সুযোগ পায়? আলমারি খুললেই তো চোখে পড়ত কত দামি দামি শাড়ি ঝুলছে, স্টিলের আলমারির লকার গয়নার ছোটবড় সব মখমল মোড়া বাক্স, কিন্তু পরতে তো বড় একটা দেখিনি। বাড়ি খালি রেখে কখনও বাইরে বেড়াতে গেলে দাদু সে-সব গয়না নিয়ে গিয়ে ব্যাঙ্কের লকারে রেখে আসত। মাঝখানে একবার পাড়ায় খুব চোর চোর উপদ্রব হয়েছিল। তখন সব রেখে এসেছিল ব্যাঙ্কের লকারে।

ঠাকুমা বলেই যে বুড়ি থুথুরি হয়ে গিয়েছিল তা তো নয়। এখন হিসেব করে দেখে বুঝতে পারি সে-সময় ঠাকুমার আদৌ সাজগোজের বয়েস চলে যায়নি। কিন্তু ছেলেবেলায় ঠাকুমাকে বয়স্ক মানুষই মনে হত। নাতি-নাতনী হলেই বোধহয় মানুষের, বিশেষ করে মেয়েদের শেষ যৌবনটাই হারিয়ে যায়। হারিয়ে যেত। আজকাল অবশ্য কেউই বয়েসের পরোয়া করে না।

আমাদের ঘরে এসে দেখি মা শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে। গল্পের বই ওই এক নেশা মায়ের।

আমি মাকে হাত নেড়ে জানালাম, দাদু তৈরি হওয়ার জন্যে তাড়া দিচ্ছে।

আগ্রহ আমারও কম ছিল না। সে বয়েসে বিয়েবাড়ি ব্যাপারটাই আমার কাছে একটা মেলার মতো মনে হ'ত। খাওয়াদাওয়ার আকর্ষণ যত না ছিল, তার চেয়ে আলো ঝলমল পরিবেশ, সেন্টের গন্ধ, ফুল পাতা দিয়ে সাজানো, আলপনা, সানাইয়ের শব্দ, আর এত এত শাড়ি গয়নার জৌলুস—সব মিলে কেমন একটা স্বপ্নের পরিবেশ গড়ে তুলত। তার কত রাত অবধি থাকা যেত। আজকাল সবই আছে, অথচ মনে হয় [illegible] বিয়ের অনুষ্ঠানও কত মজার ছিল। দেখতে ভালই লাগত। [illegible] যেন শর্টকাট। চটপট শেষ হয়ে যায়।

সন্ধে হয়েছে তখন। মা ঠাকুমাকে গিয়ে কি প্রশ্ন করল কে জানে, স্নানের ঘরে ঢুকে গেল।

মা স্নান সেরে এসে নিজের আলমারিটা খুলে শাড়ি বাছতে শুরু করল। আমি জানি, মা নিজে নিজে কোন শাড়ি পরবে মনস্থ করতে পারবে না। সব কাজ নিজে নিজে করতে পারলেও এই কাজটা কখনও পারে না।

সেই গিয়ে ঠাকুমার শরণ নিল।

ঠাকুমা হাতের ইশারায় বলল, থাক থাক।

মাকে ডেকে নিয়ে গেল নিজের ঘরে। আলমারি থেকে এমব্রয়ডারির কাজ করা একটা তসরের শাড়ি বের করে দিল।

মা খুব খুশি।

আয়নার সামনে বসে দাঁড়িয়ে তসরের শাড়িটায় কেমন মানিয়েছে দেখল। সত্যি খুব সুন্দর লাগছিল।

শাড়ি বাছাই করার ব্যাপারে, সাজগোজের ব্যাপারে, মায়ের নিজের ওপর কোনও বিশ্বাস ছিল না।

একবার মামার বাড়ি থেকে আসার সময়েও দেখেছি, কোন শাড়ি পরে আসবে সবাইকে দেখিয়ে দেখিয়ে জিগ্যেস করছে।

এক মামী বলল, তুই যা সুন্দর, যা পরবি তাতেই সুন্দর লাগবে। ব'লে চিবুক নেড়ে দিল।

মা বুঝল কি বুঝল না জানি না।

এবারও তসরের শাড়িতে বেশ সুন্দর লাগছিল। আরও সুন্দর।

তবু সন্দেহ যাচ্ছিল না, বাবাকে হাত ধরে ডেকে নিয়ে এসে দেখাল।

বাবা দুবার ঘাড় নাড়ল। তবে শান্তি।

গয়নার বাক্স বের করতে যাচ্ছিল মা।

তার আগেই ঠাকুমা এসে হাজির। হাতে চার পাঁচটা লাল চৌকো চৌকো বাক্স। যা ঠাকুমার লকারে উঁকিঝুঁকি দিত।

একটা একটা করে মাকে পরিয়ে দিল ঠাকুমা।

সব শেষে বড় চৌকো বাক্সটা থেকে একটা গিনি হার বের করে মাকে পরিয়ে দিল। সারি দেওয়া দশটা না বারোটা গিনি গাঁথা হার।

আমি বলে উঠলাম, আরে ব্বাস, মা তোমাকে রানীর মতো মনে হচ্ছে।

সত্যি তাই। আমি কি বললাম মা তো বুঝতে পারল না, শুধু এটুকুই

*একটা একটা করে মাকে পরিয়ে দিল ঠাকুমা*

বুঝল, খুব সুন্দর লাগছে।

ঠাকুমা বলল, রানীই তো।

আমি বললাম, ঠাম্মা, তুমি কখনও পরোনি কেন?

ঠাকুমা বলল, একবার পরেছিলাম, সে অনেককাল আগে। কখন পরব বল? আজকাল কি আর এসব পরে কোথাও যাওয়ার উপায় আছে?

তারপর ঠাকুমা একটা কাণ্ড করে বসল।

নিজের বুকে হাত দিয়ে তারপর মায়ের বুকে হাত ছুঁইয়ে গয়নাগুলো দেখিয়ে বলল, এসব তোকে দিয়ে দিলাম, এবার থেকে তুই পরবি।

মা বুঝতে পেরে হাত নেড়ে, 'না না' করতে যাচ্ছিল। ঠাকুমা এক ধমক দিল।

বুঝিয়ে দিল, এসব মাকে দিয়ে দিল।

তবে যে সবাই বলে গয়না নাকি মেয়েদের প্রাণ। এত সহজে দিয়ে দিতেও পারে!

কিন্তু ঠাকুমা কম সাবধানী নয়।

বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগেই একে একে সব গয়না খুলে নিল, নিজেরও যা দু'চারখানা। তারপর ব্যাগে ভরে নিয়ে গাড়িতে গিয়ে বসল। মায়ের হাতে শুধু দুখানা চুড়ি, ঠাকুমার নিজেরও। বুঝতে অসুবিধে হয়নি, বিয়েবাড়ির একটু আগে ড্রাইভারকে বলল, গাড়ি থামাও।

আলো জ্বালতে বলল না।

মাকে অন্ধকারেই গয়নাগুলো আবার পরিয়ে দিল ঠাম্মা, নিজেও পরে নিল।

এবার একেবারে বিয়েবাড়ির আলোর মধ্যে।

ঠাকুমা অস্ফুটে একটাই কথা বলল, যা দিনকাল।

ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি, বিয়েবাড়িতে সব সময়েই একটা প্রতিযোগিতা। আরও কম বয়েসে অতশত বুঝতাম না, কিন্তু ওপরের দিকের ক্লাসে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে এসব লক্ষ করার মতো জ্ঞানবুদ্ধিও বাড়ছিল। যে-কেউ কোনও বিয়েবাড়িতে যায়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব দেখে, মনে মনে স্বপ্ন দেখে, স্বপ্ন ভাঁজে, তার বাড়িতে তেমন কোনও অনুষ্ঠান যখন হবে, তখন চোখে দেখা এই জৌলুসে টেক্কা দিতে হবে। মেনুতে তেমন কোনও নতুন আইটেম দেখলে ভেবে নেয় বিয়ের ভোজে সেই আইটেমও রাখতে হবে। দু'এক জায়গায় যা নেমন্তন্ন জুটেছে সেটা দেখে এসব বুঝতে অসুবিধে হয়নি।

নেমন্তন্ন অবশ্য আমাদের খুব কমই জুটত। কেউ তো আর বাড়িতে হালুইকর বসায় না, ছ্যাঁচড়া বেগুনভাজা উঠে গেছে, এসেছে ফ্রাই কিংবা ওরলি, কেটাটারকে সব সঁপে দেওয়া হয়, পরিবেশন-পর্বও, আর ওদেরও যেহেতু প্লেটের হিসেবে টাকা দিতে হয়, তাই নেমন্তন্নও করা হয় হিসেব করে। তাই সে ভাগ্য শুধুই দাদুর, ক্বচিৎ কদাচিৎ দাদুকে ডিঙিয়ে ঠাকুমা অবধি। তাও ঠাকুমা তো যেতেই চাইত না। একা দাদুই গিয়ে সামাজিকতা রক্ষা করত। বাবা-মা'র কোনও নেমন্তন্নই জুটত না, আমার কপালে তো নয়ই।

ওই আলো, সানাই, সাজানো ঘর, সাজানো মেয়েদের উজ্জ্বলতার মধ্যে গিয়ে আমার মনে হ'ল কোন স্বপ্নরাজ্যে এসে পৌঁছেছি।

সে যে কি ভাল লাগছিল। শুধু কি আমার? বাবা মা'র মুখের দিকে তাকিয়েও মনে হল ওরাও চারপাশের আনন্দ মেখে অন্য মানুষ হয়ে গেছে। সানাই তো ওরা শুনতে পাচ্ছিল না, চারপাশে উৎফুল্ল হাসি কথাবার্তাও কানে যাচ্ছিল না, তবু শুধু চোখের দৃষ্টি দিয়েই যেন সবকিছুর আস্বাদ নিচ্ছিল।

আমার মন কিছুক্ষণের জন্যে খারাপ হয়ে গিয়েছিল সেজন্যেই।

যিনি নিমন্ত্রণকর্তা, তাঁকে তো আগেই দেখেছি, দাদুর সঙ্গে তাঁর মোলাকাত হ'ল, স্ত্রীকেও ডেকে আনলেন, দু'মিনিট কথাবার্তা, আমাদের দেখতে পেয়ে আরও খুশি...

তারপর মায়ের দিকে তাকিয়ে বলে উঠলেন, ওহ, সি লুকস লাইক আ গডেস।

তাঁর স্ত্রী বলে উঠলেন, রানী, রানীর মতো লাগছে মা তোমাকে।

শুনতে পেল নাকি মা! তবে কিছুটা বুঝতে হয়তো পারল।

আমিও তো ঠিক এই কথাই বলেছিলাম, যখন বাড়িতে মাকে গিনি হারটা পরিয়ে দিয়েছিল ঠাকুমা।

সত্যিই রানীর মতো লাগছিল মাকে। আসলে মা যে অত সুন্দর বলেই অত ভাল লাগছিল, আর সেজন্যেই সকলে দূর থেকে দেখছিল, চোখ ফেরাতে পারছিল না, তা কিন্তু মনে হ'ল না। কেমন সন্দেহ হচ্ছিল ওরা গয়নাগাঁটিই দেখছিল। নিজেরা কম পরেনি। কেউ কেউ পাথর বসানো, হীরেও হতে পারে, বেশ ঝকঝকে। কিন্তু নজর কাড়ছিল ওই গিনি হার। কি জমকালো! দুপাশে দুটো চেন, সোনার, মাঝে ফাঁক রেখে দশ বারোটা গিনি। হাতের কঙ্কনও দেখার মতোই।

আসলে ওগুলো তো পুরনো দিনের জিনিস। ঠাকুমা নিজেই হয়তো বিয়েতে পেয়েছিল কিংবা ঠাকুমার মায়ের দেওয়া। আজকাল তো কেউ দেখতেই পায় না। তাই সকলের চোখ গিয়ে আটকে যাচ্ছিল ওখানেই।

ওই বড়দের ভিড়ে আমার অস্বস্তি লাগছিল। আমি খুঁজছিলাম আমার বয়েসি কোনও ছেলে বা মেয়ে আছে কি না।

বাবা-মা'র কাছ থেকে সরে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যেতে চাইলাম।

আর তখন দেখি কি দুজন মহিলা, একেবারে আধুনিকা ধরনের, যদিও বয়েস হয়েছে, মাকে নিয়েই কি যেন বলাবলি করছে।

কানে এল একজন আরেকজনকে বলছে, অত ঢং করে সাজগোজ কেন রে বাপু, আসলে তো বোবা-কালা।

তাকিয়ে দেখি অন্যজন হেসে উঠে ঠোঁট বেঁকাল। —ছাই সুন্দর!

গিনি হারকে বলল, না মাকে, বুঝতে পারলাম না। আমার সমস্ত শরীর কেমন যেন করে উঠল।

আমি ওখান থেকে পালিয়ে এলাম।

আমার তখন উঠতি বয়েস, আমার বয়েসি কোনও সুন্দর মেয়ে চোখে পড়লে একটু তাকিয়ে দেখে নিতাম, সে-রকম কোনও বাসনা থেকেই হয়তো সরে গিয়েছিলাম। কিন্তু আর কোনও আগ্রহ রইল না। আমার বুকের ভেতরটা যেন কেঁদে কেঁদে উঠতে চাইছিল।

আমরা সবাই পাশাপাশি খেতে বসলাম।

যারা বাড়ি বয়ে নেমন্তন্ন করতে গিয়েছিল, তাদের ওপর তখন প্রচণ্ড রাগ। তারা ওদের না জানালে ওরা জানল কি করে। মনে মনে বললাম, ছোটলোক।

আরও অসহ্য লাগছিল ওই পরিবেশ দেখে, কিংবা বিয়েবাড়ি বলেই, শুধু দাদু ঠাকুমাই নয়, বাবা মাও যেন উল্লসিত। ওরা রীতিমতো উপভোগ করছিল। টেরও পায়নি যে আমার সারা শরীর জ্বালা করছে।

খাওয়ার দিকে আমার একটুও মন ছিল না, সবই কেমন বিস্বাদ লাগছিল।

বিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে স্বস্তি। স্বস্তি? ওই ঘটনা আমার সারা জীবনের সঙ্গী হয়ে রয়ে গেছে।

ফেরার সময় বিয়েবাড়ি থেকে বেরোনোর আগে ঠাকুমা আবার সব গয়না খুলে নিয়ে ব্যাগে ভরল। এত রাতে অন্ধকার রাস্তা দিয়ে যেতে হবে তাই।

আবার সেই। 'যা দিনকাল'।

শুধু বাইরের চেহারাটাই সকলের চোখে পড়ে। ভেতরে ভেতরে মানুষ যে সেই একই জায়গায় রয়ে গেছে, একটুও বদলায়নি, তা কারও মনে হয় না।

পাছে কেউ বুঝতে পারে আমি সাংঘাতিক একটা আঘাত পেয়েছি সেটা চাপা দেওয়ার জন্যে গাড়ির মধ্যে আমিও উৎফুল্ল হওয়ার চেষ্টা করলাম।

যেন কিছুই হয়নি এমন ভান করে বাড়ি ফিরে ঠাকুমাকে বললাম, গিনিহারটা দেখি ঠাকুমা, ভাল করে দেখিইনি।

ঠাকুমা হেসে বলল, দেখে নে, তোর বিয়ের পর তোর মা তো তোর বউকে দেবে। সব ক'টা গিনিতে রানীর মুখ, কয়েকটা মুকুট পরা, আর একটা টাক মাথা রাজার। দাদু বুঝিয়ে দিল, কুইন ভিক্টোরিয়া, এগুলো কম বয়েসের, আর এগুলো যখন বুড়ি হয়ে গেছে, আর এই যে টাকমাথা এ হ'ল এডওয়ার্ড।

ঠাকুমা বলল, ওসব ছেড়ে উল্টো দিকটা দেখাও।

তারপর নিজেই বলল, এই দ্যাখ, সাল লেখা আছে। কখনও পালিশ করতে দিলে সালগুলো লিখে রাখবি।

আমার হাত থেকে নিয়ে মাকে দিল ঠাকুমা। —এসব এখন তোমার।

মনে মনে বললাম, কি হবে ওসব নিয়ে, মায়ের মুখে কথা ফুটবে?

ছেলেবেলার আরও কত কথা মনে পড়ে, সে-সব শুনতে গেলে আপনার তো ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। এর মধ্যেই আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছে কি না তাও জানি না। আমাকে সব কথা লিখে ফেলতে বলে এখন হয়তো ভাবছেন ভুল করে ফেলেছি। কিন্তু আমাকে তো লিখে ফেলতে হবেই।

আমি স্কুলের দু' দুটো গণ্ডি পার হয়ে দাদুর হুকুমে জয়েন্টের পরীক্ষায় বসে পড়েছিলাম। না, স্কুলজীবনে সকলে, এমন কি টিচাররাও আমাকে যতখানি ব্রিলিয়েন্ট ভেবে নিয়ে আমার আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের উচ্চাশা আমি পুরোপুরি পূর্ণ করতে না পারলেও রেজাল্ট অন্তত দাদুর পৌত্রগর্বের পক্ষে মুখরক্ষা করার মতো হ'ল। জয়েন্ট এনট্রান্সের তালিকায় আমার নাম কিছুটা ওপরের দিকেই দেখা গেল। স্কুলের বন্ধুবান্ধবরা অনেকেই জয়েন্টের পরীক্ষায় বসেছিল, যদিও তাদের কেউই তার রেজাল্টকে বিশ্বাস করত না। সকলেই বলত ওটা একটা লোক দেখানো পরীক্ষা, ওর আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে কোনও না কোনও দুর্নীতি। সত্যিমিথ্যে জানার উপায় নেই, কিন্তু কোনও কোনও ব্রিলিয়েন্ট ছেলের এ পরীক্ষায় ধরাশায়ী হওয়া দেখে সন্দেহ জাগত। আর সাধারণ মানের ছেলেরা কি করে যে ভাল র‍্যাঙ্কিং পেয়ে যেত সেও এক রহস্য। সকলের মনেই সন্দেহ ছিল বলেই তাকে কাজে লাগাত এক শ্রেণীর দালাল। তারা ভাব দেখাত তাদের নাকি এসব জায়গায় প্রচুর প্রভাব প্রতিপত্তি। মোটা অঙ্কের টাকা পেলে পরীক্ষার্থীর স্বার্থে তা খাটাতেও তারা তৈরি। এমন কি ভাল কলেজে ইচ্ছামতো সাবজেক্ট পাইয়ে দিতেও পারবে। এগুলো দিব্যি ভাঁওতা দিয়ে ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে। টাকা দিয়ে জয়েন্টে চান্স পায়নি এমন একজন বন্ধু আমার কাছে স্বীকার করেছিল। তখন মোটা অঙ্কের টাকাটার জন্যেই তার মনস্তাপ। শেষ অবধি ফিজিক্সে অনার্স নিয়ে একটা ভাল কলেজেই ভর্তি হয়েছিল সে। আমিও ভেবে রেখেছিলাম চান্স না পেলে—ফিজিক্স। পেয়ে গেলাম। কিন্তু ওই পরীক্ষায় যে কোথাও কোনও দুর্নীতি আছে, অথবা খাতা দেখার পদ্ধতিতে, সে বিষয়ে আমার কোনও সন্দেহ নেই। তা না হ'লে এত ওলটপালট হয়ে থাকে কেন!

কলেজে ভর্তি হ লাম। কিন্তু এখানে আর এক সঙ্কোচ।

স্কুলে পড়ার সময় একটাই অস্বস্তি ছিল—বাবা-মা। নানা অজুহাতে তাদের আড়ালে আড়ালে রেখে এসেছি। পাশ করে বেরিয়ে আসার পর মনে হ'ল অকারণে এতকাল কষ্ট পেয়ে এসেছি। হয়তো ওরা কেউ কেউ জানত, কিংবা সকলেই। ভদ্রতার খাতিরে কেউ কোনওদিন উল্লেখ করেনি। কম বয়েসে মানুষ অনেক বিশুদ্ধ থাকে, পবিত্র থাকে। নীচতা তাদের স্পর্শ করে না। যত বড় হয় দুর্গন্ধের পাঁক ততই তারা গায়ে মাখতে শুরু করে।

তা না হ'লে বিয়েবাড়িতে সেই সম্ভ্রান্ত মহিলা মাকে দেখে কেন বলে উঠবে, অত ঢং করে সাজগোজ কেন রে বাপু, আসলে তো বোবা-কালা।

কথাটা মনে পড়লেই কেউ যেন আমার মাথার ভিতরে হাতুড়ি পিটত, বুকের ভেতরটা জ্বলে উঠত। বুঝতে অসুবিধে হয়নি সেই সম্ভ্রান্ত মহিলারও মাকে দেখে বুকের ভেতরটা জ্বলে উঠেছিল। মানুষ যখনই নিজেকে কারও চেয়ে খাটো মনে করে তখনই তার কিছু একটা খুঁত ধরার চেষ্টা করে নিজেকে সান্ত্বনা দিতে চায়।

ছেলেবেলায়, স্কুলজীবনে, কারও মধ্যে এ-সব বড় একটা উঁকি দেয় না। তখন তারা অনেকখানি নিষ্পাপ।

কলেজে ভর্তি হওয়া মানে তো আমি তখন পুরোপুরি বাইরের মানুষ হয়ে গেলাম।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজটাও ছিল বাড়ি থেকে অনেক দূরে।

একটা অস্বস্তি কাটিয়ে এসে এখানে আর এক অস্বস্তি। আমাদের নামিদামি স্কুলটা ছিল মিশনারি স্কুল। শুধুই ছেলেদের। কো-এড ছিল না।

আগেই শুনেছি, জানি, তবু প্রথম দিন ক্লাশ করতে এসে হোঁচট খেলাম।

আট দশটি মেয়ে আমাদের ক্লাশেই।

ছেলেবেলা থেকেই আমি একটু লাজুক প্রকৃতির। স্কুলেও আমার বন্ধুর সংখ্যা নগণ্য ছিল, তার একটা কারণ আমি নিজে থেকে এগিয়ে গিয়ে কারও সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারতাম না। এবং কেমন একটা ভাল ছেলে ভাল ছেলে সুনাম হয়ে গিয়েছিল বলে তারাও এগিয়ে এসে বন্ধুত্ব করতে চাইত না। টিচাররা কাউকে বেশি পছন্দ করে ফেললে সহপাঠীরা স্বভাবতই কেমন দূরে সরে যায়। ওটাকে ঠিক ঈর্ষা বলাও উচিত হবে না। আসলে ওরা ধরেই নেয় ভাল ছেলেরা আমাদের মতো নয়, আমাদের দলের নয়। আবার যে-কটি ছাত্রকে টিচাররা পছন্দ করেন, তারাও পরস্পরকে পছন্দ করে না। কাছে আসে না। কারণ তাদের মধ্যে তো আবার পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ব্যাপার থাকে। আমার মধ্যেও ছিল কিনা আমি জানি না। নিজের দোষ কি কেউ নিজে নিজে দেখতে পায়। আমি সকলের থেকে বিচ্ছিন্ন থাকতাম আসলে নিজেকে আড়ালে রাখতে চাইতাম বলে। একটা ভয়, একটা আশঙ্কা, একটা অস্বস্তি আমাকে তাড়া করত বলেই। আসলে বাবা-মাকে আড়ালে রাখতে গিয়েই নিজেকে আড়াল করে ফেলেছিলাম। এমন লাজুক হয়ে যাওয়ার পিছনে এটাই হয়তো একমাত্র কারণ।

আমাকে কলেজে ভর্তি করার দিনে, কাউন্সেলিঙের দিনেও বাবাই আসতে চেয়েছিল। দাদু বাবার উৎসাহ থামিয়ে দিয়ে আমাকে বলেছিল, না রে, ওর গিয়ে কাজ নেই, আমিই যাব।

কোনও প্রয়োজন ছিল না, হয়তো নিজে নিজেই গিয়ে ভর্তি হতে পারতাম, কিন্তু দাদু বলে বসল, গার্জেনের সইটই লাগতে পারে।

তাছাড়া দাদু তার কিছুদিন আগেই চাকরি থেকে ছাড়া পেয়ে গিয়েছে। দাদু নিজেই কথাটা বলেছিল। ঠাকুমাকে। বেশ হাসতে হাসতেই। বলেছিল, ব্যস্ আজ থেকে ছাড়া পেয়ে গেলাম।

অর্থাৎ রিটায়ারমেন্ট।

হাসিটা সত্যি সত্যি হাসি, নাকি ভেতরের কষ্ট চাপা দেওয়ার জন্যে তা জানি না। চাকরির জীবনটাকে লোকে সত্যি সত্যি বন্দিজীবন ভাবে? তা না হ'লে ছাড়া পাওয়ার কথা বলবে কেন? যারা দু' এক বছরের এক্সটেনশন চায় তারাও বোধহয় চাকরিজীবনকে বন্দির জীবনই ভাবে। তবু আশা করে ওই সামান্য দু' এক বছরে শেষ জীবনের সংসার একটু গুছিয়ে নেবে। আশ্চর্য! যা সারা জীবন চাকরি করেও গুছিয়ে নিতে পারেনি, তা নাকি দু' এক বছরে গুছিয়ে নেবে।

কাল থেকে ছুটি পেয়ে গেলাম, একথা দাদু বলেনি। বলেছে, ছাড়া পেলাম।

ঠিক বুঝতে পারি নি, ঠাকুমা বোধহয় একটু অসন্তুষ্টই হয়েছিল।

বলে বসল, এবার তো সারাদিন বসে বসে আমার পিছনে লাগবে। আর যত ফাইফরমাশ।

শুনে দাদু হা হা করে হেসেছিল।

একটা থোক টাকা মাসে মাসে আসছে। সেটা হঠাৎ থেমে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সংসারে কিছুটা অশান্তিও নেমে আসে। সেজন্যেই ঠাকুমা ভেতরে ভেতরে বিচলিত হয়েছিলেন কিনা কে জানে।

অবশ্য তেমন কোনও দুশ্চিন্তার কারণ ছিল বলে মনে হয় না।

বাবা কত কি রোজগার করত আমার জানা ছিল না। তবে প্রতি সন্ধ্যায় খাতাপত্তর নিয়ে বসত। দোকানের হিসেব লিখত। ব্যাঙ্কে জমা দিয়ে আসত মা।

ওই দোকানে মাঝে মাঝে আমিও গিয়েছি।

দাদু যে বাবা-মার জন্য কি অসাধ্যসাধন করেছিল ভেবে অবাক হয়ে যাই।

ওই ডেফ অ্যান্ড ডাম স্কুলে যেতে যেতেই মাকে দেখে দাদুর খুব পছন্দ হয়ে যায়। ওই স্কুল থেকে খবর নিয়ে গিয়ে হাজির হয়েছিলেন ওঁদের বাড়িতে। যাতায়াত শুরু হয়ে যায় তখন থেকেই। অর্থাৎ মামাবাড়িতে।

হয়তো তখন থেকেই সব ঠিকঠাক, কথাবার্তা হয়ে ছিল।

যথাসময়ে বিয়ে দিয়ে নিয়ে এলেন।

ঠাকুমা কোনওদিনই এক সঙ্গে এত কথা বলেনি। নানা কথার ফাঁকে ফাঁকে একটু করে জেনেছি।

বিয়ের পর একটা ভাল টেলারিং স্কুলে দু' জনকেই ভর্তি করে দিয়েছিল।

তারপর একটা বড় রাস্তায় দোকান ঘর ভাড়া নিয়ে রীতিমতো টেলারিং শপ।

বেশ একখানা বড় ঘর, মাঝখানে পার্টিশন দিয়ে একপাশে ছেলেদের, অন্য পাশে মেয়েদের। টেলারিং বললে দাদুর সম্মানে লাগত বলেই হয়তো বেশ একটা সুন্দর সম্মানজনক নাম দিয়ে দিয়েছিল।

প্রথম প্রথম নাকি মাকে-বাবাকে একা ছাড়ত না ঠাকুমা। নিজেও যেত। পৌঁছে দিয়ে আসত।। কখনওকখনও দাদু অফিসের গাড়িতে ওদের নামিয়ে দিয়ে যেত।

এখন বুটিকটা খুব ভালই চলে। দু' তিনটে লোক কাজ করে।

দাদুদের সময়ে বুটিক শব্দটার চল ছিল না। কারও কাছে শুনে অথবা কোনও দোকানের সাইবোর্ড দেখে আমাদের ওই দোকানের সাইনবোর্ডেও বুটিক কথাটা লিখিয়ে নিয়েছিল দাদু। ফলে নিজে বেঁচেছিল, আমাকেও বাঁচিয়ে দিয়েছিল। বেশ গর্বের সঙ্গেই বলা যায় আমাদের একটা বুটিক আছে। টেলারিং শপ বললে কোনও মান ইজ্জত থাকত না। আসলে তো সেই দর্জির দোকানই। সাদামাটা প্যান্ট কোট আর মা দেখত ব্লাউজের দিকটা, বেশি অর্ডার সেগুলোরই। তবু ফ্যাশনদার পোশাকও তৈরি হত। বা বা-মা নিজেরাই মাথা খাটিয়ে সে-সব বের করত, কাগজে এঁকে দর্জিদের বুঝিয়ে দিত। কখনও দেখেছি বড় কাঁচি দিয়ে কচকচ করে নানা রঙের কাপড় কেটে দর্জিকে বুঝিয়ে দিয়েছে। তারা মেটেবুরুজের কোথায় থাকত। সেলাই করে এনে দিত।

কাচের দরজা, বড় আয়না, এয়ার কন্ডিশন। কি সুন্দর করে সাজানো।

দাদুর ঘরে অনেক পুরোনো একটা অক্সফোর্ড ডিকশনারি ছিল। সাইনবোর্ডে বুটিক শব্দটা দেখে এসে মানে বোঝার জন্যে খুঁজে খুঁজে হয়রান। ছিল না। ওপরের ক্লাসে ওঠার পর একটা নতুন এডিশন কিনে দিল দাদু। পেয়ে গেলাম। মানে বুঝতে পেরে ভালই লাগল। না, নিছক দর্জির দোকান নয়। ওর গায়ে অনেকখানি মর্যাদা জড়ানো আছে। স্বস্তিতে বলাও যায়, এমন কি গর্ব বোধও করা যায়।

ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার জন্যে একজন ফিটফাট লোকও ছিল। সে মাপও নিত।

কলেজে ভর্তি হব শুনেই বাবা সঙ্গে করে নিয়ে গেল। স্কুল ড্রেস পরে স্কুলে যেতাম। বাবা ইশারা ইঙ্গিতে লোকটাকে বুঝিয়ে দিতেই সে ফিতে নিয়ে মাপ নিয়ে নিল। ট্রাউজার্সের, শার্টের।

দিনকয়েক বাদে বাবা-মা নিয়ে এল বাড়িতে।

আমাকে পরতে বলল। হাত বুলিয়ে বুঝলাম বেশ দামি কাপড়। পরে বেশ ভাল লাগল। কেমন গর্ব, গর্ব।

ওর মধ্যে যে বাবা-মা'র অনেকখানি ভালবাসা মিশে আছে বুঝিনি।

মা আমার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল দাদু-ঠাকুমাকে দেখাতে।

—তুমি তো এবার জেন্টেলম্যান হয়ে গেলে অমু। দাদুর মুখে উচ্ছ্বসিত হাসি।

ঠাকুমা বুকে জড়িয়ে ধরল।

দাদু একদিন সঙ্গে নিয়ে গিয়ে এক জোড়া নতুন জুতোও কিনে দিল।

কিন্তু প্রথম দিন কলেজে গিয়েই হোঁচট খেলাম।

দু'একজনের সঙ্গে আলাপও হল, কিন্তু অনেকেই আমার দিকে

তাকিয়ে দেখছিল। আমি নিজেও বুঝতে পারছিলাম ওদের মধ্যে, আমি কেমন যেন বেমানান। কারণ কেউই আমার মতো এমন ফিটফাট হয়ে আসেনি। একেবারে সাদামাটা পোশাক। কেউ বা এসেছে চটি চটচটিয়ে। রঙচটা প্যান্ট, চেক চেক শার্টের দুটো বোতাম খোলা। আমার ভেতরের অস্বস্তি গেঞ্জির মতো গায়ে লেপটে রইল।

দ্বিতীয় হোঁচট ওই মেয়েগুলো। কী স্বতস্ফূর্ত, কী সপ্রতিভ। বোধহয় নামি দামি কো-এড স্কুল থেকে এসেছে। এসেই সকলের সঙ্গে কী চটপট আলাপ জুড়ে দিচ্ছে। আমাদের স্কুলে কো-এড ছিল না। তার ফলেই হয়তো আমি একটু ভীতু-ভীতু, একটু জড়সড়।

অন্য বন্ধুদের মতো আমারও খুব সাধারণ হতে ইচ্ছে হল। ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলে কেউ আর আমার দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখবে না।

একজন তো ঠাট্টার স্বরে বলেই ফেলল, তুই বাড়ির খুব আদুরে ছেলে, তাই না?

লজ্জা পেয়ে বললাম, ধুৎ।

মনে মনে ভাবলাম, এই নতুন পোশাক, নতুন জুতো পরে আর আসব না।

মনে মনে ভাবা এক, আর সত্যি সত্যি সেটা করতে পারা অন্য।

বাবা-মা'র জন্যে ছেলেবেলায় আমার মনে যে কুণ্ঠা ছিল, বয়েস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেটা সমবেদনায় বদলে যাচ্ছিল।

দাদু রিটায়ার করার পর স্বভাবতই তার আগের মতো আর স্বচ্ছলতা নেই বুঝতে অসুবিধে হত না।

তবু দেরাজ থেকে টাকা বের করে বাবাকে দিতে চেয়েছিল আমার নতুন পোশাকের জন্যে। বাবা ইশারায় থামিয়ে দিয়েছিল, ইশারাতেই বুঝিয়েছিল, আমিই দেব। বা আমার কাছেই আছে।

দাদুর যখন চাকরি ছিল তখন বোধহয় ওই ব্যবসার টাকা কিছুই নিত না, নিজেই ওদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ব্যাঙ্কে একাউন্ট করে দিয়েছিল। বাবা কিংবা মা গিয়ে টাকা জমা দিত, টাকা তুলত।

বাবাকে ঘিরে দাদু-ঠাকুমার যা কিছু স্বপ্ন ছিল তা পুরণ করার কোনও উপায়ই ছিল না। তাই আমার মধ্যে দিয়েই হয়তো তা পূরণ করতে চেয়েছিল দাদু। আর সেজন্যেই বাবা-মা আমাকে বেশি করে কাছে টানতে চাইত। একটা দিকে তাদের অক্ষমতার জন্যে হয়তো মনে মনে দুঃখ পেত, তাই আমার সুখসুবিধের দিকে বেশি করে দৃষ্টি দিত।

সেজন্যেই আমার পিঠে আদরের হাত রেখে সঙ্গে করে নিয়ে গিয়েছিল।

ফলে আমাকে একটা দ্বিধার মধ্যে পড়ে যেতে হল।

পুরনো প্যান্ট, পুরনো শার্ট যে ছিল না তা নয়। কিন্তু এই নতুন ট্রাউজার্স, নতুন শার্ট, নতুন জুতো, এ-সব তো শুধুই পোশাক নয়। এর মধ্যে আমার দুঃখী বাবা-মা'র অস্ফুট ভালবাসা মিশে আছে। এগুলো ছেড়ে ফেলে আমি যদি আবার পুরনোগুলো পরতে শুরু করি তা হলে তো ওরা আরও অসুখি হবে। পোশাকটা বদলে ফেললে বাবা ভাববে তার ভালবাসাকেই উপেক্ষা করছি। অথচ আমাকে তো সকলের মতো সাধারণ হয়ে যেতে হবে। মিশে যেতে হবে।

আমাদের ক্লাশের মেয়েগুলোও এমন কিছু সাজসজ্জা করত না। কেউ কেউ শাড়ি পরত, দু তিনজন সালোয়ার কামিজ, একজনই শুধু টি-শার্ট আর জিনসের প্যান্ট পরে এসেছিল। দু'দিন পরেই সেও সালোয়ার শুরু করল।

মা-বাবা কষ্ট পাবে জেনেও আমি সেই পুরনো পোশাক পরেই আসতে শুরু করলাম।

প্রথমটা মা ভেবেছিল বেশ কয়েকদিন পরা হয়েছে বলেই পোশাক বদলেছি।

সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে ইশারায় বলেছিল, পরের মাসে আর এক সেট করিয়ে দেবে।

আমি হাত নেড়ে নিষেধ করেছিলাম।

মা অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। বুঝতে পারেনি। আমিও প্রকাশ করে তাদের আসল কথাটা বলতে পারিনি।

বাবা-মাও হয়তো দাদু-ঠাকুমার মতোই আমার সাফল্য দেখে নিজেদের জীবনের পূর্ণতা আনতে চাইছিল।

কিন্তু আমি ক্রমশই ওদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছিলাম। আমার একটা পৃথক জীবন শুরু হয়ে গিয়েছিল। আমি বাইরের মানুষ হতে চাইছিলাম।

একটু একটু করে ক্লাশের মেয়েগুলোর সঙ্গেও আলাপ হয়ে গেল, আমার মনের ভেতরের জড়তা একটু একটু করে কেটে যাচ্ছিল।

ওরা সাদাসিধে পোশাকে আসত, কিন্তু যাদের চেহারা বেশ সুশ্রী ছিল তাদের ওই পোশাকেও দিব্যি ভাল লাগত। কেউ কেউ হঠাৎ এক একদিন একটু চটকদার পোশাকও পরত। সেদিন সকলেরই তার দিকে চোখ যেত।

মেয়েদের দিকে বিশেষ দৃষ্টিতে দেখার বয়েস সেটা।

দু'একজন বন্ধু তাদের পছন্দের কারও কারও কাছে, একটু বেশি কাছে যাওয়ার চেষ্টা করত। তাদের কথাবার্তা, ব্যবহার দেখেই বোঝা যেত। আমারও যে কখনও কখনও তেমন ইচ্ছে হত না তা নয়।

আমি স্কুলজীবনে খুবই লাজুক ছিলাম। দু'একজন সহপাঠী অন্তরঙ্গ হয়েছিল, শুধু তাদের কাছেই নিজেকে কিছুটা প্রকাশ করতে পারতাম। সকলের থেকে একটু দূরে দূরে থাকা, নিজেকে আড়াল করে রাখা, তারা অনেকেই ভাবত ওটা আমার অহঙ্কার। ভাল ছেলে হওয়ায় অহঙ্কার। আদৌ তা নয়। আমার তো সত্যি কোনও কৃতিত্ব ছিল না, ভাল নম্বর পাওয়ার পিছনে ছিল অনেকখানিই মুখস্থ বিদ্যে। যা দাদু প্রশংসা করে ছোটমামাকে একবার বলেছিল, অমুর স্মৃতিশক্তি খুব ভাল, মনে রাখতে পারে।

একটা চরম দুঃখের কথা আমার সবচেয়ে বড় লজ্জা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেজন্যেই বন্ধুদের সঙ্গে খোলা মনে মিশতে পারতাম না, বন্ধু হতে পারতাম না।

এমনিতেই আত্মীয়স্বজনরা বড় একটা বাড়িতে আসত না, আসতে চাইত না। তাদের অস্বস্তিও কম ছিল না। বাড়িতে এসে যদি শুধুই দাদু আর ঠাকুমার সঙ্গে কথা বলতে হয়, বাবা-মা এলেই সব চুপচাপ, কারণ ওরা তো কেউ ওদের ভাষা ভাল করে বুঝতে পারত না, ওদের ভাষায় কথা বলতেও পারত না। যেচে এই অস্বস্তির মধ্যে কে-ই বা আসতে চাইবে।

এইসব কারণেই হয়তো আমি এত লাজুক ছিলাম।

কিন্তু কলেজের পরিবেশটাই এমন যে আমাকেও বদলে দিচ্ছিল। ভীষণভাবে বেপরোয়া হয়ে ওঠার ইচ্ছেও হত।

চাকরি থেকে রিটায়ার করার পর থেকে দাদুও কেমন যেন বদলে যাচ্ছিল। একেবারে অন্য মানুষ। ঘরোয়া। বাজারে যায় নিত্যদিন, হাতে থলে নিয়ে, সংসারের খুঁটিনাটি খবর রাখে, ইলেকট্রিকের মিস্ত্রি ডেকে আনে, জলের কল নিজেই সারাবার চেষ্টা করে। ঠাকুমাও বিরক্তি প্রকাশ করত। একটা লোক স্যুট-টাই পরে ফিটফাট অফিসে যায়, সকলে সমীহ করে, আর চাকরি থেকে ছুটি হয়ে গেলেই সে যখন আসল মানুষটায় ফিরে আসে, তখন তাকে সবাই অন্য মানুষ ভেবে বসে।

বুড়োদের কেউই বোধহয় পছন্দ করে না। কেউ তাদের সঙ্গে গল্প করতে চায় না। বসে আড্ডা দিতে চায় না। আত্মীয়স্বজনদের আসা-যাওয়াও কমে গিয়েছিল সেজন্যেই। তাদের দোষ নেই। বুড়োদের আলোচনার বিষয়বস্তু এত ছোট, একটা গণ্ডির মধ্যে ঘোরাফেরা করে যে কারও ভাল লাগে না। আমি যে আমি, দাদু-ঠাকুমাকে নিয়েই যার শৈশব কৈশোর কেটেছে, এত কাছের মানুষ ছিল যারা, আমার কাছেও তাদের কোনও আকর্ষণ ছিল না। এড়িয়ে এড়িয়ে চলতাম।

কলেজের বন্ধুরাই তখন আমার জীবন। লাজুক ভাবটা কিছুদিনের মধ্যেই কেটে গেল।

সমীর আর বিশ্বনাথ খুব বন্ধু হয়ে গেল।

হওয়া উচিত।

দোষের মধ্যে মেয়েটা বেজায় ফর্সা। তার জবাবে বিশ্বনাথ স্রেফ বিশে। ব্যাখ্যা দিয়েছিল, কি বিখ্যাত নাম দেখ, বিশে ডাকাত তো ইতিহাসে নাম রেখে গেছে।

আমরা সবাই হেসে উঠেছিলাম, আমিও। ওই যে আগেই বলেছি, কো-এড স্কুলে পড়িনি বলে মেয়েদের কাছে এলেই আমার মধ্যে কেমন একটা জড়তা দেখা দিত। কিন্তু কেমন করে যেন হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়ে, বিশেষ করে সমীর আর বিশ্বনাথের পাল্লায় পড়ে আমি বদলে যাচ্ছিলাম।

বিশ্বনাথ মৌসুমীকে ডাকত মনসুন বলে, অমলকে আমূল, জগন্নাথকে জগন্নাথো।

মুখে আগল ছিল না বিশ্বনাথের।

পাছে আমাদের সামনে মেয়েদের সম্পর্কে, বিশেষ করে স্বাতী সম্পর্কে তার কোনও দুর্বলতা প্রকাশ হয়ে পড়ে, তাই বলল, আমার বাবা কি পুলিশ সার্জেন্ট, যে নন-পার্কিংয়ের গাড়ি ধরে নিয়ে গিয়ে ছ'শো টাকা করে ঘুষ আদায় করে?

বিশ্বনাথকে ও কোনওদিন পার্স থেকে টাকা বের করতে দেখেছে। বলল, আহা, তোর পকেটেই তো কত টাকা।

এত নির্লজ্জ ছেলেটা। বলে বসল, সে টাকা আমার বাবা তার ভাবী বউমাকে ক্যান্টিনে খাওয়ানোর জন্যে দেয়নি।

এরপরই তার কাঁধে ফটাস করে একটা চড়।

বিশ্বনাথ অপ্রতিরোধ্য। বলল, কি নরম মাইরি তোর হাতটা।

শোনার জন্যে আর অপেক্ষা করেনি স্বাতী। তার আগেই চলে গেছে স্বস্থানে।

এতখানি না হলেও ইয়ার্কি ফাজলামি যে কেউ কেউ করত না তা নয়। সমানে জবাব দিত মেয়েরাও। কিন্তু কেউ কারও সম্পর্কে কোনও দুর্বলতা দেখাচ্ছে বলে মনে হয়নি। পাঁচ মিনিট পরেই মিটমাট হয়ে যেত, তখন সবাই নিছক বন্ধু।

এরপরই অবশ্য বিশ্বনাথ কাউন্টার থেকে এক প্লেট চিকেন পকৌড়া নিয়ে স্বাতীর সামনে রেখে এসেছিল।

স্বাতী থ্যাঙ্কিউ বলেনি, ওর দিকে চোখ তুলে তাকায়ওনি। না, ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া দূরের কথা, হেসে উঠে সব মেয়েগুলো ভাগাভাগি করে খেয়েছিল। স্বাতীও।

আড্ডা জমানোর আর একটা জায়গা ছিল কমনরুম।

যখনই কোনও পিরিয়ড ফাঁকা পাওয়া যেত আমরা গিয়ে জুটতাম ওখানে।

ঘরখানা বেশ বড়সড়, কিন্তু বসার জায়গা ছিল কম। কারণ সারা ঘর জুড়ে মাঝখানের অংশ বেদখল করে রেখেছিল একটা টেবল-টেনিসের টেবল। বসার জায়গা শুধু চার দেওয়ালে পিঠ লাগানো চারটে লম্বা লম্বা বেঞ্চ। চুপচাপ বসা বা নীচু স্বরে গল্প করা ছাড়া গতি ছিল না। কারণ টেবল-টেনিস খেলত প্রায় সময়েই সিনিয়র ছাত্রছাত্রীরা। সিনিয়র ছাত্রদের সমীহ করাই রীতি ছিল। সিনিয়র ছাত্রীদের মধ্যেও বেশ একটা দিদি-দিদি ভাব ছিল। ওই দিদি-দিদিদের র‍্যাকেট হাতে খেলতেও দেখেছি সিনিয়র ছাত্রদের সঙ্গে। ওদের খেলার মধ্যে ছটফটানি চিৎকার হাসাহাসিও কম ছিল না। আমাদেরও বেশ মজা লাগত।

কিন্তু ওই পর্যন্তই, র‍্যাকেট হাতে নিয়ে খেলতে চাওয়ার অধিকার ছিল না জুনিয়রদের। অলিখিত নিয়ম। দু'চারজন বেঞ্চে আমাদের পাশে বসেই অপেক্ষা করত একটা গেম শেষ হলেই উঠে গিয়ে র‍্যাকেট ছিনিয়ে নেবার জন্যে। কোনও কোনওদিন অবশ্য তারা অধৈর্য হয়ে বাইরে গিয়ে সিগারেট টানত, ঘাস বিছানো একটু ফাঁকা মতো জায়গা ছিল সেখানে।

সিগারেট দুটো-একটা তখন আমিও খাই। সমীর, বিশ্বনাথও, তবে কলেজের বাইরে গিয়ে।

বিশ্বনাথের প্রভাবে, নাকি ওদের নিজেদের উদ্ভাবন, মেয়েরাও দেখি নিজেদের মধ্যে পরস্পরের নাম বিকৃত করে ডাকতে শুরু করেছে। আমাদের সামনাসামনি নাম বিকৃত করে ডাকত না বটে, কিন্তু স্থির নিশ্চয় ছিলাম, ওদের কাছে আমাদেরও এক একটা উদ্ভট নাম দিয়ে রেখেছে ওরা।

আমার নাম তো অমৃত, বাড়িতে অমু বলে ডাকে।

বিশ্বনাথের কাছ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় নেই, ও ডাকত 'মৃত'

*একজনই শুধু টি শার্ট আর জিনস পরে এসেছিল*

বলে। পরে ওটাকে বদলে, স্রেফ মুর্দা।

সেই যে প্রথমদিন একটি মেয়ে জিনসের প্যান্ট আর টি-শার্ট পরে এসেছিল, সে একদিন এবং তারপর মাঝে মাঝে ক্যান্টিনে আমাদের দলে এসে বসত। মেয়েটা যেমন স্বতঃস্ফূর্ত, তেমনই সপ্রতিভ।

ফস্ করে একদিন বিশ্বনাথের ধরানো সিগারেটটা ওঁর ঠোঁটের বাঁধন থেকে কেড়ে নিয়ে দু'চারটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছেড়ে কাশতে কাশতে ফেরত দিতে গেল।

বিশ্বনাথ নিল না, তোর এঁটো আমি খাব কেন রে, ওটা তুই খা।

—বিচ্ছিরি খেতে, কেন খাস্! মেঝেতে ফেলে সিগারেটটা জুতোয় মাড়িয়ে দিল।

বিশ্বনাথ বলল, বাপের পয়সা ওড়াতে।

সমীর হেসে বলল, ওড়াতে নয় পোড়াতে বল।

—এ ভাবে পয়সা না উড়িয়ে...

বিশ্বনাথ তাকে কথা শেষ করতে দিল না। হাসতে হাসতে বলে উঠল, টাকা জমে গেলেই তো মনে হবে তোকে একটা গিফট্ কিনে দিই, নিউ ইয়ার্স কার্ড পাঠাই ...

—আঃ, লাভলি।

ঠিক তখনই ওদিকের টেবিল থেকে ডাক এল, নন্দু, উঠে আয়, উঠে আয়। জমে যাস না।

চেয়ারটা পিছনে ঠেলে দিয়ে চলে গেল নন্দু। যার আসল নাম নন্দিতা। আমরা জেনে গেলাম ওরাও নিজেদের সুন্দর সুন্দর নামগুলোকে মুচড়েদুমড়ে টোল খাওয়া পিতলের ঘটি বানিয়ে দিয়েছে।

এত এত মেয়ে, কয়েকজনের সঙ্গে রীতিমতো বন্ধুত্ব হয়ে গেছে, তাদের সঙ্গে গল্প করতে, আড্ডা দিতে ভালই লাগে, ছুটির পর বাড়ি ফেরার সময় কেমন একা একা লাগে, মনে হয় শরীর মন থেকে কেউ যেন সব রস নিঙড়ে বের করে নিয়েছে, যেন আরও কিছুক্ষণ আড্ডা দিলে ভাল লাগত ... কিন্তু এ-রকম তো আর কখনও মনে হয়নি।

নন্দিতা আমাদের টেবিল থেকে উঠে যাওয়ার পরই আমার কি খিচ করে একটা কাঁটা বিধল!

আমি জানতেও পারিনি সেই প্রথমদিন দেখা জিনস আর টি-সার্টের ছবিটা আমার মনে গাঁথা হয়ে গেছে, যদিও সেদিন ওকে খুব বেমানান লেগেছিল, ভিতরে ভিতরে বোধহয় নাক সিঁটকে ছিলাম।

বিশ্বনাথের দেওয়া মুর্দা নামটাই বোধহয় আমাকে ঠিক মানায়। ওরা তো কেউ আমার মতো আড়ষ্ট নয়, দিব্যি আলাপ করে কথাবার্তা বলে, হাসে, হাসির কথা বলে ওদের হাসায়। আমি পারি না কেন!

আমাকে কি আমার বাবা আর মা পিছন থেকে টেনে ধরে রেখেছে!

নন্দিতা সম্বন্ধে আমার মনে কোনও দুর্বলতা গড়ে উঠেছে বলে তো মনে হয়নি। ওর উপস্থিতিটুকুই ভাল লেগেছিল। সে-রকম তো আরও অনেকের ক্ষেত্রেই লাগে। তবে?

নন্দিতা এসে আমাদের দিকে তাকিয়ে দেখেইনি। তার চোখের দৃষ্টি বড়জোর ঘুরন্ত সার্চলাইটের মতো মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে গেছে। যা কিছু কথা বলেছে বিশ্বনাথের সঙ্গে, সব সময়ে তার চঞ্চল চোখজোড়া বিশ্বনাথের দিকেই দৃষ্টি ফেলেছে বারবার।

আর দু'জনের কথাবার্তায় বাইরে থেকে নির্দোষ রসিকতা মনে হলেও সন্দেহ হল তার মধ্যে অন্য কিছু নিহিত নেই তো? ওই যে ইংরেজিতে বলে ইন বিটুইন দ্য লাইনস্! সে জন্যেই বোধহয় খিচ করে বুকে লেগেছিল।

ওদিকে টেবিলের মেয়েগুলো যখন নন্দু চলে আয় বলে ডেকেছিল তখন খুবই খারাপ লেগেছিল। নন্দিতা বেশ সুন্দর নাম, তাকে নন্দু বলার কোনও অর্থ হয়!

মনের মধ্যে কেবল ঘুরছিল উপহার দেওয়া কার্ড পাঠানোর কথা বিশ্বনাথ বলল কেন। ও কি নন্দিতাকে সত্যি সত্যি কোনও গিফট দেবে, কার্ড পাঠাবে? নন্দিতার জন্মদিন কবে কে জানে। হয়তো সেদিনই পাঠাবে।

ওর মুখের সিগারেট কেড়ে নিয়ে নিজের ঠোঁটে গুঁজতে তো কোনও দ্বিধাই করেনি।

তবে ফস ফস করে যখন দু'চারটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়ল তখন ওকে দারুণ স্মার্ট মনে হয়েছিল।

আমি আড়ষ্ট লাজুক ভীতু ভীতু মানুষ, জীবনে ঠাকুমা ছাড়া মাসি-পিসিদের সঙ্গও পাইনি, মায়ের সঙ্গে যতই কথাবার্তা চালিয়ে যাই না কেন, মাঝখানে একটা পাঁচিল থেকেই যায়, এই কলেজে এসেই আমার নবজন্ম হয়েছে, হয়েছে কি? তা হলে এত সংকোচ কেন। আমিও তো দু'চারটে কথা বলতে পারতাম নন্দিতার সঙ্গে। সমীর তো বলেছে।

বাড়ি ফেরার পথে সেদিন বাসে বসে থাকতে থাকতে বারবার অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝেই ওই দৃশ্যটা দেখতে পাচ্ছিলাম। আর বুকের মধ্যে কাঁটা খিচখিচ।

যতই আড্ডা দিই, পড়ার চাপ কম ছিল না। পড়তে বসেও মনটাকে সেদিকে নিয়ে যেতে পারছিলাম না।

আমার মুখে সেদিন কোনও পরিবর্তন হয়েছিল কিনা জানি না, বাবা-মা দোকান বন্ধ করে ফিরত দেরিতে, তার আগেই রান্নার মেয়েটা কিছু খেতে দিত, তবু কেন জানি না মা হঠাৎ আমার মুখের দিকে চেয়ে প্রশ্ন করল, দুপুরে কলেজে কিছু খেয়েছি কি না। ঘাড় নাড়ার পরও ইশারায় বোঝাল, যেন ভাল ভাল কিছু খাই।

ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল, টাকায় কুলিয়ে যাচ্ছে কি না?

আমি ঘাড় নাড়ব কি নাড়ব না ভাবছি, মা ব্যাগ থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে বোঝাল, রেখে দে। বেশ হাসিহাসি মুখ।

হয়তো সেদিন খুব ভাল বিক্রিবাটা হয়েছে, বাবাও খুশি-খুশি।

টাকাটা নিয়ে রাখলাম ঠিকই, মনও প্রসন্ন, তবু মনে হল আমি ওদের কাছ থেকে দূরে সরে আসতে চাইছি। ছেলেবেলার মতো সেই টান আর অনুভব করছি না। ওদের প্রতি সেই সমবেদনাও যেন অনেক কমে গেছে।

দাদু ঠাকুমার সঙ্গেও আর আগের মতো বসে গল্প করতে ইচ্ছে হয় না। অবসর নেবার পর দাদুও কেমন বদলে গেছে। পোশাকের সঙ্গে সঙ্গে মানুষটাও। রাস্তায় দেখলে কেউ বিশ্বাসই করবে না এই লোকটাকেই একদিন সকলে সমীহ করে কথা বলত, মুশকিল-আসান ভেবে ছুটে আসত বুদ্ধি নিতে। আমার চোখেই তো স্যুটশোভিত টাই-পরা দাদুকে সাহেব সাহেব লাগত, গর্ব হত।

সেই মানুষটিকেই আমি এড়িয়ে এড়িয়ে চলি।

দু'একদিন কাছে গিয়ে বসার চেষ্টা করেছি, কোনওদিন বা উনি নিজেই ডেকেছেন আমাকে।

হাতের খবরের কাগজটা সরিয়ে কাষ্ঠহাসি হেসে মুখের দিকে তাকিয়েছেন, প্রশ্ন করেছেন, লেখাপড়া কেমন চলছে, অথবা সদুপদেশ, শুধু আড্ডা দিয়ে সময় নষ্ট করো না, অমু, দিস ইস দি টাইম ফর বিল্ডিং ইওর ফিউচার।

গল্প জুড়তে গেলেই ঘুরে ফিরে আমাদের সময়ে কলেজে যা ডিসিপ্লিন ছি...

আমাদের ক্লাসেও যে বেশ কয়েকটা মেয়ে আছে জেনে গিয়েছিল ঠাকুমা। মুখ ফুটে কিছু বলেনি, কিন্তু খবরটা শুনেই একটু শঙ্কিত বোধ করেছিল বলেই মনে হয়েছিল।

একদিন মুখ ফুটে বলেই ফেলল, শোনো বাছা, একটা কথা বলি। এই বুড়ির কথা একেবারে ফ্যালনা ভেবে ফেলে দিও না।

আমি ধরেই নিয়েছিলাম পড়াশোনা বিষয়ে কিছু বলবে। এই বুড়োবুড়ির আমার সঙ্গে লেখাপড়ার বিষয় ছাড়া আর যেন কোনও কথা নেই।

দাদু তবু মাঝে মাঝে ওদের সময়ে কোন জিনিসের কত দাম ছিল শুনিয়ে আমাকে অবাক করে দেবার চেষ্টা করত। আমাকে তা স্পর্শও করত না, অবাক হওয়া তো দূরের কথা। দাদু আগে তবু টিভি দেখত, সেইসব প্রসঙ্গ টেনে কথা বলত, খবর শুনে। শুধু খবর আর খবর, আর কোনও কিছুতে কোনও আগ্রহ ছিল না। ইদানীং তাও দেখে না। টিভি

দেখে শুধু ঠাকুমা। দাদুর সঙ্গী সকাল থেকে সন্ধে ওই খবরের কাগজ। কানে একটু কম শুনছে বলে টিভির সাউন্ড বাড়িয়ে দিতে হয়, আর বাড়িয়ে দিলেই ঠাকুমা রান্নাঘর কিংবা বারান্দা থেকে চিৎকার জুড়ে দেয়, কমাও, কমাও কানের পর্দা ফেটে যাবে।

বুটিক থেকে ফিরে বাবা হিসেবের খাতা নিয়ে বসে, বাঁ-হাতে রুটি নিয়ে চিবোয়, ডান হাতে হিসেব লেখে। মা, আমার বোবা-কালা। মা গা ধুয়ে এসে আটপৌরে শাড়ি জড়িয়ে গদি আঁটা কুশনচেয়ারে গা এলানো ঠাকুমার পিছনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ টিভি দেখে। শব্দ কিছুই কানে যায় না, তবু ছবি দেখেও মনে হয় উপভোগ করছে। হেসেও ফেলে হাসির ব্যাপার হলে।

আমি তো এসব দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছি।

মায়ের সঙ্গেও কথাবার্তা কমই হয়। যদিও বাবা-মার সঙ্গে বাক্যালাপ করতে কোনও অসুবিধেই হয় না। আসলে বলতে ইচ্ছেই করে না। আমি বাইরের মানুষ হয়ে গেছি।

লেখাপড়া নিয়ে মায়ের কোনও উৎকণ্ঠা নেই। হয়তো জানেও না, বোঝেও না। যত দুশ্চিন্তা আমার শরীর নিয়ে, ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া হচ্ছে কি না।

হঠাৎ একদিন হাত বাড়িয়ে আমার কাঁধ পিঠ টিপে টিপে দেখল, রোগা হয়ে যাচ্ছি কি না, ইশারায় জিগ্যেস করল দুপুরে খাচ্ছি কি না।

রাত্তিরে আমরা সবাই একসঙ্গে টেবিলে বসে খেতাম। মা ঠাকুমা পরিবেশন করত, খাবার গরম করে আনত। ওরা পরে বসত।

মা আমাকে একটু বেশি বেশি দিত, ইশারায় বলত, খেয়ে নে খেয়ে নে। ভাতের শেষে দুধ খাওয়া আমাদের ছেলেবেলা থেকে অভ্যাস।

একদিন খিদে নেই, কমিয়ে দিতে বলায় কি রাগ! চোখে। কিছুতেই কমাল না।

এই ভাবেই চলে যাচ্ছিল দিনগুলো।

তার মধ্যে বেশ একটা হাসির ব্যাপার ঘটল।

ঠাকুমা টি ভি দেখতে দেখতে আমাকে বলল, বসো এখানে।

পাশে একটু দূরত্ব রেখে বসলাম। আগের মতো একেবারে গায়ের কাছে বসতে ইচ্ছে করে না তাই।

ঠাকুমা বলল, একটা কথা বলি শোনো।

তারপর, সেই বুড়ির কথা ফ্যালনা ভেবে...

বলল, ক্লাসে মেয়েরা পড়ে পড়ুক। কিন্তু কোনও মেয়ের দিকে বারবার তাকাবে না, বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকবে না।

আমি অবাক হয়ে বললাম, কেন?

ঠাকুমা গম্ভীর হয়ে বলল, বারবার দেখলে কালোকুচ্ছিত মেয়েকেও সুন্দর মনে হবে, ভালবাসা হয়ে যাবে। খুব সাবধান।

আমি হো হো করে শব্দ করে হেসে উঠলাম।

শব্দটা মায়ের কানে গেল না, চোখ বুঝল দারুণ হাসির কিছু কথা হয়েছে।

বারবার জিগ্যেস করছে, কি হয়েছে?

বলতে পারলাম না, ওখান থেকে সরে গেলাম।

আমি নিজের মনকেই প্রশ্ন করলাম, সত্যি কোনও মেয়ের সঙ্গে কি আমার ভালবাসা হয়ে গেছে? দূর, চারিচক্ষুর মিলন হলেই কি ভালবাসা হয়ে যায় নাকি? আমার তো কারও সঙ্গে চারিচক্ষুর মিলনই হয়নি। তা ছাড়া সেসব কথা মনেও আসে না যখন ওদের সঙ্গে মিশি। আমি মিশি না, মেশামিশি যেটুকু তা সমীর আর বিশ্বনাথের। আমার শুধু উপস্থিতি। সামনাসামনি বসেও চোখের দিকে তাকাতে পারি না।

কো-এড স্কুলে ভর্তি করেনি বলে দাদুর ওপর রাগও হয়। যারা কো-এড থেকে এসেছে, ছেলে বা মেয়ে, তারা কত সপ্রতিভ। দিব্যি সরল ভাবে কথা বলে, রসিকতা করে, হাসে হাসায়। ষোলআনা বন্ধু হয়ে যেতে পারে।

বাংলা মিডিয়ম থেকেও কয়েকটা ছেলে, কয়েকটা মেয়ে এসেছিল। জয়েন্টের পরীক্ষায় ভাল র‍্যাঙ্কিং ছিল। হয়তো খুবই মেধাবী, হতেও তো পারে। মেধা যতই থাক না কেন, প্রথম প্রথম বড় কুঁকড়ে থাকত। তার কারণ ক্লাশে যাঁরা লেকচার দিতেন, বা হাতেকলমে কিছু বুঝিয়ে দিতেন, সবই ফ্লুয়েন্ট ইংরেজিতে, অনর্গল। ওদের বুঝতে অসুবিধে হত কখনও কখনও, দারুণ একটা হিউমার ছেড়েছেন হয়তো তিনি, আমরা সবাই হেসে উঠেছি, বাংলা মিডিয়াম গম্ভীর, বেশ সময় নিয়ে তারা হেসে ওঠার ভান করেছে। বুঝতে পারেনি সকলের সামনে তো স্বীকার করা যায় না। যখন একটু ভাবসাব হয়ে গেছে, তখন সাহস করে কনুইয়ের খোঁচা মেরেছে, কি বলল রে। কিছু বুঝিনি। দু-চারবার বুঝিয়ে দেওয়ার পর জড়তা কেটে গেছে তাদের, বন্ধু হয়ে গেছে। ভরসা পেয়ে মাস্টারমশাইয়ের প্রশ্নের উত্তরও দিয়েছে সাহস করে। আমরা ইংরেজি মিডিয়মরা ওদের একটু করুণার চোখে, কিঞ্চিৎ খাটো করেই দেখতাম। ওরাও ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগত।

ফার্স্ট ইয়ার থেকে সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার পর এই ব্যবধান একেবারেই ঘুচে গিয়েছিল। বিশেষ করে ওদের মধ্যেই দু'তিনজন আমাদের চেয়েও ভাল রেজাল্ট করায়। ওদের জড়তা কেটে যাওয়ার কারণ পরে জানতে পেরেছিলাম। গোপনে গোপনে ওরা কোথায় নাকি স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস করে।

আমারও জড়তা কেটে গিয়েছিল সমীর আর বিশ্বনাথের জন্যেই।

ওদের অত বাছবিচার ছিল না, কিন্তু দলে একটা দুটো মেয়েকে সব সময়েই টেনে আনত। তারা বোধহয় ওদের পছন্দও করত। দিব্যি জমিয়ে আড্ডা দিত। সেভাবেই কবে থেকে জানি না, আমিও চৌখশ হয়ে উঠেছি, মেয়েদের সঙ্গে ঠাট্টা ইয়ার্কিও করি, বন্ধু হয়ে যেতে পারি।

সত্যি বলছি আপনাকে, আপনি এত এত লোকের মনের কথা জানতে পারেন বলেই, আমার বিশ্বাস, এটুকু নিশ্চয় বুঝবেন, একটা ছেলে আর একটা মেয়ে একেবারে বন্ধু হয়ে যেতে পারে। নিছক বন্ধুত্ব। তাদের সঙ্গে গল্প করতে আড্ডা দিতে ভালই লাগে, ক্বচিৎ কদাচিৎ তাদের শরীরের সৌন্দর্য যে চোখে পড়ে যায় না তাও নয়, তবু তা মুছে যেতেও সময় লাগে না। উপরন্তু বন্ধুত্বটুকুও হারানোর ভয়ে সেই মুহূর্তের মুগ্ধতাকেও টুঁটি চেপে মেরে ফেলতাম, কোনও প্রশ্রয়ই দিতাম না।

তবু কখনও কখনও যখন একটি ছেলে আর একটি মেয়ে মাঝে মাঝে পৃথক হয়ে গিয়ে ক্যাম্পাসের গাছ তলায় বই বুকে নিয়ে হেসে হেসে গল্প করত, দাঁতে ঘাসের শিস কাটত অফ পিরিয়ডে, তখন আমরাও ভেতরে ভেতরে সন্দেহ করতাম, সামথিং ইজ ব্রিউয়িং, তাদের ডেকে ঠাট্টাতামাশা করলেই যদি ছেলেটি লজ্জা পেত, মেয়েটির বেশি বেশি অস্বস্তির রঙ দেখা দিত কানের নীচে, তা হলে সন্দেহ বেড়ে যেত।

মেয়েটা দেখতে তেমন আহা মরি না হলেই বুড়ি ঠাকুমার উপদেশটা মনে পড়ে যেত। নিজের মনেই হেসে ফেলতাম।

—হাসছিস যে! সমীর হয়তো প্রশ্ন করল।

বলতাম, ঠাকুমার উপদেশ মনে পড়ে গেল।

ওরাও হেসে ফেলত, কারণ ঠাকুমার কথাগুলো সমীর আর বিশ্বনাথকেও পরের দিনই এসে না বলে শান্তি পাইনি।

ওরাও প্রচুর হেসেছিল। তারপর নন্দু আর মনসুন, মানে নন্দিতা আর মৌসুমী, দুজনকে ডেকে বলেছিল, এই শুনে যা, শুনে যা।

ওরা কৌতূহল নিয়ে ছুটে আসতেই, মুর্দার ঠাকুমা কি অ্যাডভাইস দিয়েচে শুনে রাখ। কাজে লাগবে তোদেরও।

—কি? কি? ওদের মুখেও হাসি ছড়িয়ে পড়েছে।

সমীরই ঠাকুমার কথাগুলো রিপিট করল।

কি হাসি দুজনের, নন্দিতা মুখ চাপা দিচ্ছে দুহাতে হাসি থামাতে না পেরে।

মনসুন বলে বসল, সেকালের বুড়িগুলোর পেটে পেটে এত বুদ্ধি। কি করে জানল বল তো!

ঠাকুমাকে নিয়ে হাসিঠাট্টা আমার কিন্তু একটুও ভাল লাগেনি।

ওই রসিকতার জন্যেই কি না কে জানে, ও দুটো তুখোড় মেয়ে নিশ্চয়ই গিয়ে মেয়েদের মধ্যে রটিয়ে দিয়েছিল, অথবা একটা ছেলে আর

একটা মেয়েকে কে যেন সিনেমাহলে পাশাপাশি দেখে ফেলেছিল, সেজন্যেও হতে পারে, হঠাৎ মেয়েগুলো একটা কাণ্ড করে বসল।

ওরা নিজে থেকে চৌকাঠ ডিঙোতে না চাইলে খুবই সাবধানী।

সেটা রাখিপূর্ণিমার আগের দিন।

ওরা এসে আমাদের সকলকে মানে সব ছেলেগুলোকে বলে বসল, কাল যেন ডুব মারিস না, কলেজে আসবি।

—কেন? কাল কি স্পেশাল কিছু আছে? আমরা প্রশ্ন করলাম।

ওরা বলল, কাল রাখি নিয়ে আসব, তোদের রাখি পরাব। আর তোরা ক্যান্টিনে আমাদের ভাল ভাল কিছু খাওয়াবি।

ওরা চলে যাওয়ার পর সমীর বলল, ভাল প্ল্যান ভেঁজেছে রে, আমাদের পয়সায় খাওয়ার।

বিশ্বনাথ বলল, তুই একটা বুদ্ধু। আসলে রাখি পরানোর প্ল্যান কেন বুঝলি না, অঙ্কুরেই বিনাশ করতে চায়, পাছে কেউ কাউকে বলে বসে, আই লাভ ইউ।

মজার ব্যাপার হল, আমরা ছেলেরা সকলেই সেদিন ডুব মেরে দিয়েছিলাম। এক গাদা রাখি নিয়ে এসে, এক একটার রাখির যা দাম আজকাল, মেয়েগুলো বোকা বনে গিয়েছিল।

কিন্তু কাণ্ড ঘটে গেল একটা।

আমাদের বাড়ি বড় নির্জীব মনে হত, ছেলেবেলা থেকেই। অন্তত পাশের বাড়ির তুলনায়। পাশের বাড়ি থেকে ছেলেমেয়েদের চিৎকার চেঁচামেচি বিনা অনুমতিতেই আমাদের ঘরে প্রবেশ করত, উচ্চ স্বর গান ভেসে আসত টি ভির, কখনও পাড়া সম্পর্কিত মাসিমা ও মেসোমশাইয়ের কলহ-কল্লোল। তুলনায় আমাদের বাড়ি ছিল শান্ত নিঃশব্দ। ঠাকুমা যখন টি ভি দেখত তখনও তৃতীয় পর্দায়, দাদু খবর শোনার সময় আর এক পর্দা বাড়ালেই ধমক খেত, কমাও কমাও। আমার তো টি ভি-র কোনও আকর্ষণই ছিল না, বড় জোর ক্রিকেট খেলা, তখনও ঠাকুমা এসে রিমোট হাতে নিয়ে কমিয়ে দিয়ে যেত।

আমার ধারণা দাদু ঠাকুমার চাপা স্বরে কথা বলা, সাউন্ড কমিয়ে টিভি দেখা ইত্যাদির পিছনে বোধহয় বাবা-মায়ের প্রতি সমবেদনা। আহা, ওরা তো শুনতে পাচ্ছে না, আমরা উপভোগ করছি দেখে হয়তো খারাপ লাগবে। অথচ শুনতে না পেলেও বাবা কিংবা মা এক একসময় টিভির সামনে বসে সিরিয়াল দেখত। বুঝতে পারত! ঈশ্বর হয়তো ওদের দৃষ্টিশক্তির মধ্যে কোনও অতিরিক্ত কল্পনাশক্তি দিয়েছেন, যা শ্রবণশক্তির অভাব পূরণ করে দিত।

আমাদের বাড়িটাকে নির্জীব মনে হত সে-কারণেই। সকালে কাজের মেয়েটা বাসন মাজতে আসত, অথবা রান্নার লোক এলে, বাসনের ঝনঝানানি অথবা উচ্চস্বর কথাবার্তা শোনা যেত।

তখনও ঠাকুমা সাবধানী, আস্তে, আস্তে।

একটি মাত্র শব্দ কখনও কখনও আমাদের সচকিত করত।

টেলিফোনের ক্রিরিরিং ক্রিরিরিং আওয়াজ।

টেলিফোন রাখা ছিল দাদুর ঘরে। যাতে শুয়ে শুয়ে হাত বাড়িয়েও ধরতে পারেন। বসার ঘরে রেখেও তো কোনও লাভ ছিল না। বেজে যাচ্ছে বেজে যাচ্ছে দাদু বাথরুমে, ঠাকুমাকে ছুটে এসে ধরতে হত। আমি তখন খুবই ছোট, রিসিভার তোলার অধিকার দেওয়া হয়নি, কারণ ওই যন্ত্রটা অফিস থেকেই দেওয়া, কোন বড় কর্তা কখন জরুরি কথা বলবেন আমি বুঝতে না পেরে উল্টোপাল্টা উত্তর দিয়ে বসব, অথবা দাদু বাজার থেকে ফিরে এলে বলতেই ভুলে যাব, তাই।

অথচ টেলিফোন করতে পেতাম।

হয়তো স্কুলে দু'একদিন যেতে পারিনি, অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম, তখন কোনও সহপাঠীকে ফোন করে কি কি পড়ানো হয়েছে জেনে নিতে পারতাম।

দাদু রিটায়ার করার পর ওটা তুলে নিয়ে গেল।

মুখ দেখে মনে হল দাদুর কাছে এটা অসম্মানজনক মনে হয়েছে।

ঠাকুমা বলেছিল, নিয়ে যাক না, কীই বা দরকার আমাদের।

আমারও যে খারাপ লাগেনি তা নয়, যদিও আমি বড় একটা ব্যবহার করতাম না। কিন্তু এটুকু বোঝার বয়েস হয়েছিল যে, ওই বিচিত্র অলঙ্কারটির সঙ্গে শুধু ঘরের শোভাই নয়, পরিবারের স্ট্যাটাস নামক বায়বীয় উপাদানটাও জড়িয়ে আছে।

দাদুর কিঞ্চিৎ প্রভাব প্রতিপত্তি ছিল, পরিচিতের মহলটাও ছোট ছিল না। সে-সময় টেলিফোন পাওয়া যেত না, বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হ'ত, কিন্তু কোন কৌশলে জানি না, মাস দু'তিন পরেই সেই অসাধ্যসাধন ঘটিয়ে ফেলল।

বলল, টেলিফোন এসে যাচ্ছে।

এসে গেল।

ঠাকুমার মুখ খুশি খুশি, স্ট্যাটাসের হাওয়া তার গায়েও লাগেনি তা তো নয়।

তবু ঈষৎ আপত্তি, মাসে মাসে এতগুলো টাকা...

দাদু বলে উঠল, মাসে মাসে নয়, দু'মাস অন্তর।

ব্যাপার বোঝা গেল। রিটায়ারমেন্টের পর মানুষ বড় একা হয়ে পড়ে। সঙ্গীহীন। তখন বোধহয় ওটাই সঙ্গ দেয়, অন্তত বৃদ্ধদের। মাঝে মাঝে ফোন করত অপিসের ফেলে আসা সহকর্মীকে, অথবা কোনও পরিচিত জনকে। গল্প জুড়ে দিত। দু'একদিন বাসে দেখা করতে যেত। কারণ তখন তো আর অফিসের গাড়িটিও নেই।

এই টেলিফোনের নম্বরটি কলেজের একটি মেয়েকে দিয়ে ফেলতে হয়েছিল। না দিয়ে উপায় ছিল না।

কলেজে এদিকে সেকেন্ড ইয়ারে ওঠার পর আমরাও সিনিয়র দলভুক্ত হয়ে গেছি, একটা অধিকার করতলগত হয়েছে ফ্রেশারদের কিছুটা উপেক্ষা করার। যারা কমনরুমের পিং পং টেবিলটি অধিকার করে বসেছিল এতকাল, তাদের কয়েকজন পাশ করে বেরিয়ে গেছে।

টেবিল-টেনিস খেলাটায় অভ্যস্ত হওয়ার গোপন ইচ্ছে ছিল বহুদিন থেকে। সমীর বা বিশ্বনাথের ওদিকে কোনও আগ্রহই ছিল না। না থাক্, ততদিনে অন্য সকলেই বন্ধু হয়ে গেছে, মেয়েগুলোর সঙ্গে চুটিয়ে আড্ডা দিতে আমিও পারঙ্গম।

আমাদের অফ পিরিয়ডে ক্যান্টিনের দুটো চৌকো টেবিল জোড়া লাগিয়ে ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে বসি। হট্টগোল করে আড্ডা দিই। কোনও ছেলেরই কোনও চটকদার কথাকেই মেয়েরা নির্বিবাদে যেতে দেয় না, সমানে রিটার্ন দেয়, র‍্যালিও চলে দীর্ঘক্ষণ ধরে।

নন্দিনীর সঙ্গে কথা বলার সময় কোনও আড়ষ্টতা আমাকে আবিষ্ট করে না।

সিঁড়ি বেয়ে ঝাঁক বেঁধে নেমে আসছি, সমীর আর বিশ্বনাথ কোথায় ছিটকে পড়েছে জানি না, হঠাৎ আবিষ্কার করলাম নন্দিনী আমার পাশে পাশে নামছে।

কমনরুমের পাশ কাটিয়ে মাঠে, যেটাকে আমরা নাম দিয়েছিলাম গ্রিন বেল্ট, একটা গাছের তলায় ফুরফুরে হাওয়ায় বসব। না, নন্দিনীর সঙ্গে নয়, অতখানি কাছে তখনও আসিনি। আসলে চোখ খুঁজছিল সমীর আর বিশ্বনাথকে।

কিন্তু কমনরুম পার হওয়ার সময়, নন্দিনী তখনও পাশেপাশেই হাঁটছে একরাশ বই-খাতা বুকে চেপে।

স্বগতোক্তির মতো বলে ফেললাম, টেব্‌ল-টেনিস খেলাটা শিখতে এত ইচ্ছে করে!

—সে কি, জানো না?

তেমন কোনও রোমাঞ্চ বোধ করেছিলাম বলে মনে হয় না।

আপনি হয়তো ভাবছেন নন্দিনীর প্রশ্নের মধ্যেই নিহিত ছিল সে খেলতে জানে, এবং তার জন্যেই রোমাঞ্চিত হওয়ার কথা বলছি। আদৌ তা নয়। আজকাল অনেক মেয়েই তো টেব্‌ল-টেনিস খেলে, মেডেলটেডেলও নাকি পায়। সুতরাং অবাক হওয়ার কথা নয়। আসলে সুযোগ পাওয়ার কথা। ও পেয়েছে, আমি পাইনি তাই জানি না।

আসলে আমি ওর কথা শুনে কিছুট বিহ্বল বোধ করেছিলাম

কিনা জানি না।

আমরা তো তখন সকলেই পরস্পরকে তুই বলায় অভ্যস্ত। চালু করেছিল হয়তো মেয়েরাই। বুঝতে অসুবিধে হয়নি, কৌশলটা ওদের বর্ম। বেশিরভাগ ছেলেদের মধ্যেই একটা হ্যাংলাপনা থাকে। ওরা তা জানে। সুতরাং সম্পর্কটা যাতে নিছক বন্ধুত্বের মধ্যেই আটকে থাকে, সেজন্যেই এই ব্যবস্থা। অবশ্য স্বীকার করতে হবে তুই তুই বলার ফলে বন্ধুত্ব বেশ ঝটপট গাঢ় হয়ে ওঠে।

ওই যে রাখি পূর্ণিমার দিন ওরা রাখি পরাতে চেয়েছিল, পরিবর্তে শর্ত দিয়েছিল ক্যান্টিনে ভাল মতো খাওয়াতে হবে, কেউ কেউ ভেবেছিল ওটা স্রেফ বোকা বানিয়ে আমাদের পয়সায় খেতে চাওয়া। তা কিন্তু নয়। পকেটে পয়সা থাকলে মেয়ে বন্ধুটিকে খাওয়াতে সকলেই অকৃপণ। আমার যদ্দুর বিশ্বাস, তখন অবধি কেউই মনের দিক থেকে জোড়া বাঁধেনি। কেউ কারও প্রতি বেশি অনুরক্ত হয়ে থাকলেও সংগোপনে সেটুকু মনের মধ্যে চেপে রেখেছে। কিন্তু কেউ হাতে রাখি পরিয়ে দিলে তারপর 'তুমি চলে যাওয়ার পর নিজেকে এত একা লাগে' বলতে গেলে হোঁচট খেতে হয়, বলা যায়ও না। সে জন্যেই ছেলেরা কেউ-ই সেদিন আসেনি।

পরের দিন মেয়েরা তা নিয়ে কোনও উচ্চবাচ্যও করেনি, কিংবা দু'একজন হয়তো হাসতে হাসতে বলেছে, তোরা কি কিপটে রে, খাওয়াতে হবে এই ভয়ে এলি না। এত কঞ্জুস হলে দেখবি বউ ভেগে যাবে।

হো হো হাসি। সকলের।

তবু স্বীকার করছি নন্দিনীর কথায় একটু বিহ্বলতা বোধ করেছিলাম।

আড্ডায় কখনও কখনও ওর উপস্থিতি ঘটত। পাশাপাশি কখনও বসেছে বলে মনে পড়ে না, দু'চারবার যাও বা তর্কাতর্কি বা ঠেস দিয়ে কথা বলেছি তখনও তা স্রেফ ভাববাচ্যে, মনেই পড়ল না ও কখনও আমাকে 'তুই' বলেছে কিনা, আমি ওকে।

ও বলে বসল, সে কি খেলতে জানো না?

পরক্ষণেই 'ঠিক আছে, ঠিক আছে আমি শিখিয়ে দেব।'

আমার পা হয়তো থেমে গিয়েছিল, কমনরুমের দিকে ফিরে যাব ভেবেছিলাম, নন্দিনী হেসে উঠে বলল, 'আজ না, আজ না, আরেকদিন'।

বলল, আজ ওই ছায়ায় গিয়ে বসতে ইচ্ছে করছে।

ঝাঁকড়া গাছটার নীচে ঘন ছায়া, সকলেরই লোভ ঘাস বিছোনো ওই ছায়াটুকু, বেশ কয়েকজন ইতিমধ্যেই সেখানে জমে গেছে।

মনে মনে ভাবছি কতক্ষণ আর ভাববাচ্যে কথা বলা যায়, 'সে কি, খেলতে জানো না' বলার মধ্যে তো 'তুমি' লুকিয়ে আছে, কিন্তু সবাই তো সবাইকে 'তুই' বলি, ওকে 'তুমি' বলতে গিয়ে ঠোক্কর খাবো না তো?

বিশ্বনাথ অবশ্য বলেছিল, আরে ওসবে কিস্যু আটকায় না, আমার দাদা বউদি তো এখনও পরস্পরকে 'তুই' বলে।

আমি আর সমীর একসঙ্গে বলে উঠলাম, বিয়ের পরও?

—বিয়ে করেছে বলেই তো বউদি বললাম, তা না হলে তো নাম ধরেই ডাকতাম।

তারপর হাসতে হাসতে বলল, এখনও মাঝে মাঝে নাম ধরেই ডাকি। শেকসপিয়র বলে গেছে না, হোয়াট্স ইন এ নেম?

সমীর বলল, ওটা অন্য অর্থে।

সেজন্যেই মনে মনে ভাবলাম, যদি 'তুই' বলে ফেলি তাতেই বা কি ক্ষতি।

আসলে নন্দিনীর পাশাপাশি ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে ভালই লাগছিল, কথা কিছুই বলছিলাম না, তবু।

সেই বয়েসটায়, সত্যি বলতে কী, মেয়েদের সম্পর্কে অদম্য কৌতূহল জেগেছে, কৌতূহল তো আরও অনেক কম বয়েস থেকেই, নিজের অজান্তেই দ্রষ্টব্য অংশে চোখ চলে যায়, এবং সব মেয়েকেই ভাল লাগে, তার সঙ্গ।

অন্য সকলের থেকে নন্দিনীকে তখনও পৃথক করে ফেলিনি।

হাঁটতে হাঁটতেই নন্দিনী বলল, আমাদের বাড়ির থেকে মিনিট দশেক দূরে একটা বড় পার্ক আছে। সেখানে একপাশে লোকে, মানে বুড়োরা বেড়ায়, কিন্তু টেনিস কোর্টও আছে, আর ইনডোর খেলার ব্যবস্থাও, সেখানে টেব্‌ল-টেনিস শেখানো হয়। আমি তো কত কম বয়েস থেকে খেলছি, শরীর খুব ফিট থাকে।

বাংলা মিডিয়মের ছেলেমেয়েরা যেমন একসময় ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্সে ভুগত, আমার মধ্যেও সে-রকম একটা হীনম্মন্যতা দেখা দিল। টেব্‌ল-টেনিস ব্যাপারটা এমন কিছু আহামরি বিষয় নয়, তবু নন্দিনীর তো এটা প্লাস পয়েন্ট।

গাছতলায় পৌঁছে নন্দিনী একেবারেই ভিড়ের মানুষ হয়ে গেল।

কলেজ ছুটির পর সকলে দল বেঁধে বাস স্টপের দিকে যাচ্ছি, বিশ্বনাথ আর সমীর মৌসুমীকে নিয়ে মত্ত, চিৎকার করে জোক্স শোনাচ্ছে, জানি না আমি পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে কীভাবে যেন নন্দিনীর কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম।

সবাই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাসের জন্যে হন্যে হয়ে দাঁড়িয়ে আছে, আমরাও, অন্যদের থেকে একটু দূরত্ব পেয়ে আমি সাহস করে বলে ফেললাম, প্রথম প্রথম যে সেই জিন্স্ আর টি-শার্ট পরে...। দারুণ লাগত।

পরের মুহূর্তেই কারেকশন করে বললাম, মানে, দারুণ স্মার্ট লাগত।

—তাই? আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কেমন একটা মজার হাসি হাসল।

তারপর হঠাৎ বলল, ঠিক আছে, আর একদিন পরে আসব। ফর ইয়োরস্ সেক। বলতে বলতেই বাস এসে গেল, ঝট্ করে উঠে চলে গেল।

একবারও ফিরে তাকাল না বলে, একটু খারাপ লাগল।

পরে নিজের মনকে বোঝালাম, বাসে উঠে চলন্ত বাসে নিজেকে সামলাতে এত ব্যস্ত থাকতে হয় তখন কি আর পিছন ফিরে তাকানো যায়!

সামনে দিন কয়েকের লম্বা ছুটি। এ ওর কাছে ফোন নম্বর নিচ্ছে, খাতায় বইয়ে টুকে রাখছে, কারও কারও হাতব্যাগে ডাইরি, তার পাতায়।

সেদিনই ফিরে এসে দাদুর ঘরে ঢুকে টেলিফোন নম্বরটা দেখে নিলাম।

ভাগ্যিস টেলিফোনটা নিয়েছে, না থাকলে প্রেস্টিজ থাকত না।

কলেজে কয়েকজন পরস্পরের ফোন নম্বর নিচ্ছে দেখেই নিজেদের নম্বরটা লিখে রাখা। মুখস্থ করে ফেলা। একটু গোপন ইচ্ছে বা আশা কি ছিল যে নন্দিনী যে কোনওদিন ওটা চেয়ে বসতে পারে।

কানে বাজছে ছোট্ট একটু টুকরো কথা। ফর ইয়োরস্ সেক। উচ্চারণ ওই রকমই। ও কথায় কী বোঝাতে চেয়েছে নন্দিনী? কিছু কি বোঝাতে চেয়েছে? ওর মনে তা হ'লে আমার জন্যে কোনও বিশেষ স্থান আছে? থাকলেও সেটা একেবারে ধরাছোঁয়ার বাইরে। এক এক সময় বড় রহস্যময়ী মনে হত। তখনই এর ওর পাশ কাটিয়ে সিঁড়ি ভেঙে, কিংবা দু'তিন ধাপ সিঁড়ি লাফিয়ে সটান আমার পাশে, কখনও আমার সঙ্গে দিব্যি গল্প জুড়ে দিয়ে গাছতলার নির্জন আরাম থেকে 'এই অম্লান, এই অম্লান' বলে ছুটে যাওয়া এবং তার সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলতে বলতে অন্য দিকে চলে যাওয়া, যেন আমার অস্তিত্বটাই ভুলে গেছে।

সেদিন বাসে উঠে একবারও ফিরে তাকায়নি বলে ঈষৎ অভিমান যে হয়নি তা নয়। কাঁধে ঝোলা ব্যাগ, একহাত রডে, ঘুরে দাঁড়ানোর, হাত নাড়ার সুযোগ ছিল না, তবু কেমন যেন উপেক্ষিত মনে হয়েছিল। তেমনই আমাকে ফুচকা খাওয়ার শেষে শাল পাতার ঠোঙা ফেলে দেওয়ার মতো তাচ্ছিল্য দেখিয়ে 'অম্লান অম্লান' বলে ছুটে যাওয়াও আমাকে আঘাত দিয়েছিল।

অম্লানের সত্যি কোনও দোষ নেই, অথচ তার ওপরই আমার রাগ পড়ল।

ওকে নিয়ে আমরা সবাই হাসাহাসিই করতাম।

বিশ্বনাথের হাত থেকে রেহাই পায়নি, ওর নাম দিয়েছিল, গিরগিটি। সঙ্গে ব্যাখ্যা : ব্যাটা বর্ণচোরা।

সকলেই আমরা সাদামাটা পোশাকেই আসতাম। দু'চারজন তো রীতিমতো রিচ ফ্যামিলির ছেলে। অথচ দেখে বোঝার উপায় নেই, জামা

*কাল রাখি নিয়ে আসব, রাখি পরাব, আর তোরা ক্যান্টিনে আমাদের ভাল ভাল খাওয়াবি*

প্যান্টে রীতিমতো গরিবানির ছাপ। ওটাই তখনকার দস্তুর। ইট্‌স ফ্যাশনেবল্‌ টু বি পুওর। কে বলেছিল ঠিক মনে নেই।

অম্লান তাদের মধ্যে আবার পৃথক।

দেখে সবাই হেসে ফেলত। একটা প্যান্ট পরে এসেছে, ট্রাউজার্স, তার হাঁটুর কাছে তাপ্পি মারা, তাও অন্য রঙের। শার্ট, কোত্থেকে জুটিয়েছে কে জানে, মোটা মোটা লাল স্ট্রাইপ।

জিগ্যেস করতে বলল, চৌরঙ্গির ফুটপাথে কিনেছি।

কোনওদিন বা ডিপ হলুদ রঙের গোল-গলা পাঞ্জাবি আর সবুজ প্যান্ট।

শীতের সময় একদিন একটা পাতলা বালাপোষ গায়ে দিয়ে চলে এসেছিল।

সবাই হাসছে। এমন কী প্রফেসর মিসেস নাগও পড়াতে পড়াতে ওর দিকে চোখ যেতেই হেসে ফেললেন।

—এত শীত করছে যখন, লেপটা নিয়ে এলেই তো পারতে।

সারা ক্লাস হেসে উঠেছিল। কিন্তু অম্লানকে অপ্রতিভ করে কার সাধ্য।

দাঁড়িয়ে উঠে বলল, ম্যাডাম, বাসে লেপ গায়ে দিয়ে ওঠা যায় না।

এবার ম্যাডামের হাসির পালা। সিট ডাউন, সিট ডাউন।

নানা রঙের উদ্ভট ধরনের এক একটা পোশাক পরে আসা ওর অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। সকলকে চমকে দিতে হবে। তাতে কী লাভ সে ওই জানে।

বিশ্বনাথ সেজন্যেই নাম দিয়েছিল, গিরগিটি। যে ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলায় বলে বহুরূপীও বলে। কিন্তু বহুরূপী বললে ঠিক উপহাস করা হয় না, তাই।

এ তো গেল ছেলেদের পোশাক পর্ব।

মেয়েদের মধ্যে কেউ অত দুঃসাহসী ছিল না। এমনিতে তারা পড়াশোনা করা ভাল রেজাল্ট করা মেয়ে, খুব সিরিয়াসলি লেকচার শুনত, দুঃসাহস যদি বা দেখাত তা বাইরে কোথাও, তবে কেউই বড় একটা ওড়না নিত না। ভিড়ের বাসে সম্ভবত নয়। তবে, দু'চারজন হঠাৎ হঠাৎ ভাল শাড়ি পরে চলে আসত, কিংবা চোখ ঝলসানো পল্‌কা ডটের কামিজ। একদম গোড়ালি অবধি ঝুল কামিজ দেখে সুমিত্রাকে একবার বিশ্বনাথ ডেকেছিল, এই তালিবান, শুনে যা।

আসলে তালিবানরা ওই রকম ঝুলওয়ালা কুর্তা পরে বলে।

নন্দিনীর এ-সব পোশাকআশাকে বৈচিত্র্য দেখিয়ে চমকে দেওয়ার নেশা আদৌ ছিল না। কিন্তু ব্যবহার ছিল অদ্ভুত।

এখনই সুনন্দর সঙ্গে পরপর দু'দিন একেবারে সেঁটে আছে, আবার একদিন মন্মথ তার মনোমতো।

এ মেয়ে কারও মনে এতটুকু দুর্বলতা গজাবার সুযোগ দিলে তো!

আমার মনে একদিন একটু অভিমান হয়েছিল, কিন্তু ওর হাবভাব দেখে ভিজে কাপড় দিয়ে স্লেটটা মুছে দেবার চেষ্টা করেছিলাম।

দূর থেকে আমার গোবেচারি মুখ দেখে মায়া হয়েছিল কিনা কে জানে। আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম।

হঠাৎ দেখি সেই প্রথম দিনের মতো জিন্‌স আর টি-শার্ট পরে উদয় হয়েছে।

ক্লাশ শুরুর আগেই কাছে চলে এসে কানে কানে, কি, দারুণ লাগছে?

আমি হতবাক্‌। ভোলেনি তাহলে!

আর পিরিয়ডে কমনরুমের সামনে দিয়ে যাবার সময় উঁকি দিল ভেতরে। আমিও। টেবিল ফাঁকা। র‍্যাকেট দুটো আর পিং পং বলটা পড়ে আছে।

—আজ শেখাব।

বলে হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল।

আমার মতো আনাড়িকে টেবল টেনিস শেখানো যে কি দুরূহ কর্ম তা তো জানত না, আমার অক্ষমতায় হেসে লুটোপুটি।

আধ ঘণ্টা খেলার পর ছুটি। বলল, আবার একদিন।

যেতে যেতে সান্ত্বনা দিল, আরে বাবা, সাইকেল চড়া শিখতে গিয়েও কত হাঁটু ছড়ে গেছে, শিখেছি তো তারপরও।

ওর এক একটা গ্লাস পয়েন্ট শুনি, আর মনে হয় ও যেন আরও দূরে চলে যাচ্ছে।

এক এক সময় মনে হত নন্দিনী রহস্যময়ী, কখনও মনে হত বড় অস্থিরচিত্ত, কোনও কিছুতেই মতিস্থির নেই। দিন কয়েক আলোকের সঙ্গে ওঠা বসা, ইয়ার্কি করে তার সযত্নে আঁচড়ানো টেরি হাত বাড়িয়ে এলোমেলো করে দিচ্ছে। রেগে যাচ্ছে আলোক। সে ব্যাপারে আমার খুশি হওয়ারই কথা, কারণ চেহারায় না পারুক, রেজাল্টে ও আমার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। তবু আলোকের সঙ্গে তার এতখানি ঘনিষ্ঠতা আমার ভাল লাগত না। বুকে কোথাও কি একটু লাগত? কে জানে।

আসলে লাগত অন্য জায়গায়। আমাকে উপেক্ষা করায়। বন্ধুত্ব থেকেও হয়তো অধিকার বোধ জন্মে যায়। ও আমার কথা শুনে আমাকে খুশি করার জন্যে জিন্স আর টি-শার্ট পরে এসেছে, এসে কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলছে, কি ভাল লাগছে? সত্যি কথা বলতে কী, কলেজে ঢুকে প্রথম দিন যখন দেখি ওকে, বড়ই বেমানান লেগেছিল। নিজেকেও। ওই যে বাবা আদর করে নিয়ে গিয়ে বুটিকের সবচেয়ে ভাল দর্জিকে দিয়ে দামি পোশাক বানিয়ে দিয়েছিল, সেটা পরেই তো প্রথম প্রবেশ, সেটাও ছিল বেমানান। আসলে আমি তখন তো গোবেচারি গোবেচারি ছিলাম, মেয়েদের সঙ্গে মিশিনি কখনও, মিশতেও পাইনি, তাই প্যান্ট পরা মেয়ে দেখতে অভ্যস্ত ছিলাম না। অথচ ওর সেদিনের ছবিটা চোখে গাঁথা হয়ে গিয়েছিল। রি-ওয়াইন্ড করে সে ছবিটা পরে যখন মাঝেসাঝে স্মৃতির চোখে দেখেছি, ভালই লেগেছে। সেজন্যেই বলে ফেলেছিলাম, হয়তো অন্য কোনও কথা খুঁজে না পেয়ে।

কানের কাছে একটি মেয়ে ফিসফিস করে বলছে, সে তো প্রায় শরীর স্পর্শ করার সামিল, এবং আমার কথা শুনে সেই পোশাকে এসে হাজির হয়েছে, আমার ধন্য হয়ে যাবারই কথা।

উপরন্তু একদিন হাত ধরে টেনে নিয়ে গেছে কমনরুমে, হাসি-হল্লোড়ের মধ্যে দিয়ে খেলা শেখাচ্ছে, একটু অধিকারবোধ জন্মে গিয়েছিল।

কিন্তু নন্দিনীর কি মতি স্থির আছে নাকি। পরের দিন থেকেই আলোকের সঙ্গে জমে গেল। যখনই দেখা পাই, ক্লাশে, ক্যান্টিনে, গাছতলার ছায়ায়, আলোকের সঙ্গে।

সমীরও একদিন, আমাকে একটু খোঁটা দেবার জন্যে কিনা কে জানে, শোনালো, কি রে মুর্দা, তুই সত্যি মুর্দা হয়ে গেলি নাকি। নন্দু তো দেখছি, আলোকের সঙ্গে সেঁটে গেছে।

ভীষণ খারাপ লেগেছিল। ওই ধরনের ভাষায় কথা বলতে অভ্যস্থ ছিল অনেকেই, এমনকী মেয়েরাও দু'চারজন, শুনতে আমি অভ্যস্ত, যদিও মুখ ফুটে নিজে বলতে পারি না, তবু নন্দিনী সম্পর্কে এ ধরনের কথা, 'সেঁটে যাওয়া,' শুনতে ভীষণ খারাপ লেগেছিল।

—ছিঃ এভাবে বলিস না, ও তো আমাদেরও বন্ধু, আলোকের বন্ধু হতে পারে না?

প্রতিবাদ না করে পারিনি।

সমীর হেসে উঠেছে। —বাব্বা, এত?

আসলে ওরা হয়তো আমাকে আর নন্দিনীকে কিঞ্চিৎ সন্দেহ করতে শুরু করেছিল। ওই যে দিন কয়েক কাছাকাছি দেখেছে। ব্যস্।

কিন্তু ওদের মাথামাথি আমারও ভাল লাগছিল না।

প্রতিবাদের ফল হল এই, সমীর বলে বসল, বাব্বা, এত? তুই কি উঠোনের সিমেন্ট বাঁধানো বেদি বানিয়ে ওকে তুলসী চারা করে বসাবি নাকি!

আমি হেসে ফেললাম, কিন্তু কথাটা খুব মিথ্যে বলেনি। নন্দিনীকে আমি একটু পবিত্র পবিত্র দেখতে চাইতাম।

আলোকের সঙ্গে বসে গল্প করছে বলেই তো ও অপবিত্র হয়ে যাচ্ছে না। নিজের মনকে স্তোক দেওয়া।

নন্দিনীর যা স্বভাব, ওর কোনও মতিস্থির নেই।

আবার একদিন এসেই 'কাম কাম, লেট আস হ্যাভ এ গেম অর টু।'

তারপর সুর করে করে, পিং পং, পিং পং, পিং পং।

অফ পিরিয়ড পেলেই, টেবিল খালি থাকলেই, কমনরুমে।

খেলাটা দিব্যি শিখে গেলাম বেশ কয়েকদিনে। তারপর একদিন বসে বসল, ধুস্, ওসব এখন আর ভাল লাগে না। যাও না, ওখানে তো আছে কেউ না কেউ, তাকে নিয়ে প্র্যাকটিস কর।

আমার সঙ্গ দূরের কথা, আমার উপস্থিতি সম্পর্কেও যেন বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই।

অথচ তারপরই দু'দিন কলেজ ছুটি।

কলেজ ছুটি তখন আমার দু'চক্ষের বিষ। একটুও ভাল লাগে না।

আমাকে কাটিয়ে অন্য কার কাছে যেন চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ ফিরে এসে, খাতার পাতায় কি যেন লিখল, এগিয়ে দিল।

দেখি একটা ফোন নম্বর।

—ফোন করো। একটু হেসে, রিং মি আপ, ইফ ইউ ফিল লোনলি। যত্ন করে ওটা রেখে দিলাম। বুকের ভেতরে ভেতরে রিনরিন রিনরিন।

ও বোধহয় আশা করেছিল আমার নম্বরটাও ওকে দেব।

কেমন অস্বস্তি হল।

চলে যাচ্ছিল, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে : বাড়িতে ফোন নেই?

—আছে। (ভাগ্যিস আছে)

এবার একটা কাগজে লিখে দিলাম। ও সেটা ব্যাগের মধ্যে রেখে দিল।

যেভাবে রাখল এবং ছুটতে ছুটতে চলে গেল, ধরেই নিলাম হারিয়ে ফেলবে।

মনে মনে চাইলাম ও যেন ফোন না করে। করবে না তাও ভেবেছিলাম। কিন্তু ওর ফোন নম্বর লেখা কাগজটা আমার বুক পকেটে হৃৎপিণ্ডের গতিবেগ বাড়িয়ে দিয়েছে।

একটা নম্বর দিলেই কি ফোন করা যায় নাকি! যদি ওর বাবা-মা ধরে। যদি বলে বসে, কেন ওকে কি দরকার! উল্টে একটা ভয়, ও যদি ফোন করে বসে। করবে না জানি, তবু।

পরের দিন ছুটি, সারাক্ষণ কান দাদুর ঘরের দিকে। ফোন তো ওখানেই।

হঠাৎ সন্ধের দিকে দাদুর চিৎকার। অমু, অমু, তোমাকে ডাকছে।

ছুটে গেলাম।

দাদু রিসিভার এগিয়ে দিল হাসি হাসি মুখে। হাসিটা কৌতুকের। ফোন ধরেছি, বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছে, কে বলছেন?

—কে তুমিই বলো।

বললাম, নন্দিনী?

জবাবে, পুওর সোল, তোমাকে ফোন করার মতো আর কেউ আছে নাকি?

তাড়াতাড়ি ছাড়তে পারলে বাঁচি। দাদুকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু দাদুর মুখের কৌতুকের হাসিটা দেখেছি।

বললাম, কি বলছো বলো।

অপর প্রান্ত থেকে ধমক : আঃ, চুপচাপ ধরে থাকো না, লেট আস এনজয় দি সাইলেন্স। কি মজা বলো, কেউ কিচ্ছু বলছি না, চুপচাপ রিসিভার ধরে আছি, ইচ্ছে করলেই কথা বলা যায়...।

মনে মনে বলছি, তুমি বড়লোকের মেয়ে হতে পারো, আমি নই। দাদু রিটায়ার্ড লোক, ভ্যাগিাস আমি করিনি, কল বাড়ত।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, বলো, কি বলবে?

ও প্রান্ত থেকে রসিকতা : রিসিভারটা বুকের ওপর স্টথোসকোপের মতো রাখো, তোমার হার্টবিট শুনি। তারপরেই খিলখিল হাসি।

ঝট করে কেটে দিলাম।

কিন্তু অত সহজে নিস্তার পাওয়া যায় নাকি।

বাবা-মাকে নিয়ে কোনও সমস্যা নেই। শুনতেই পায় না, এমন কী টেলিফোন রিং হয়ে গেলেও ওরা নির্বিকার। কিন্তু দাদু, ঠাকুমা!

দাদু হাসতে হাসতে ঘরে ঢুকল। আমাকে কথা বলার স্বাধীনতা দেবার

জন্যে বেরিয়ে গিয়েছিল বোধ হয়।

ফিরে এসে প্রশ্ন : কে, গার্লফ্রেন্ড?

নন্দিনীর ওপর বিরক্ত হয়েছিলাম। নিতান্ত বাধ্য হয়েই ফোন নম্বরটা দিয়েছি। বাড়িতে একটা ফোন আছে সেটা জানাবার জন্যেই। সত্যি সত্যি ফোন করে বসবে ভাবিনি। ফোন করার কথা বরং আমার।

যদি বা ফোন করল, সবই যেন ইয়ার্কি ফাজলামির ঢঙে। 'চুপচাপ ধরে থাকো না, লেট আস এনজয় দি সাইলেন্স।' তারপর 'রিসিভারটা বুকের ওপর রাখো, তোমার হার্টবিট শুনবো।'

আর ঝট্ করে কেটে দেওয়া। লাইন কেটে দেওয়ায় নিস্তার পেয়েছি ঠিকই, কিন্তু রাগও হয়েছে।

সেই রাগ গিয়ে পড়ল কিনা দাদুর ওপরে। 'কে? গার্লফেন্ড?'

গম্ভীর গলায় বললাম, গার্ল তা তো গলা শুনেই বুঝেছ, আর ফ্রেন্ডও। কিন্তু গার্লফেন্ড নয়। তোমরা তো শুধু ওসবই ভাবো।

রাগটা ছিল বলে রক্ষে তা না হলে দাদুর কথায় লজ্জা পেয়ে যেতাম। আর তাহলে দাদু টের পেয়ে যেত ওই মেয়েটির সম্পর্কে নিজেরই অজান্তে আমার মনের কোণে কোথাও একটা ভ্যাকুয়াম সৃষ্টি হয়েছে।

তোমরা তো শুধু ওসবই ভাবো। বেশ জুতসই জবাব দিয়েছি ভেবেছিলাম।

দাদু ছাড়ার পাত্র নয়।

বলল, এছাড়া আর যা আছে, তা তোমার লেখাপড়ার কথা। সে তো একেবারে নীরস ব্যাপার।

বলে উঠলাম, কেন পলিটিক্স নেই?

আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে কিন্তু পলিটিক্সের দাপট একেবারেই ছিল না। সে-সব পাট আগেই চুকিয়ে এসেছি। যতটা পেরেছি, দুরে দূরেই থেকেছি।

দাদু গিয়ে বসল বেতেবোনা হেলানো আরাম কেদারায়। ওটা খাটের পাশেই দেওয়াল ঘেঁসে রাখা আছে।

আগেকার দিনের বাড়ি, ঘরগুলোও বেশ বড় বড়, দাদুর ঘরটা আরও। দাদু যখন শুয়ে থাকে, কিংবা বালিশে হেলান দিয়ে আধশোয়া, যথেষ্ট জায়গা থাকলেও ঠাকুমা খাটের ধারে পা ঝুলিয়ে বসে না। তখন কাজকর্ম করে ক্লান্ত শরীরটা এলিয়ে দেয় এই আরাম কেদারায়। ফুল স্পিডে পাখা চালিয়ে দিয়ে।

তখন ঠাকুমা নেই বলেই দাদু তার দখল পেল।

বলল, পলিটিক্স? ও তো গার্লফ্রেন্ড জোটে না বলেই করে। কো-এড কলেজ গার্লফ্রেন্ড জোটানোর জন্যে।

প্রতিবাদ করে বললাম, কী যে আজেবাজে বল।

মনে পড়ে গেল ক্লাশের কমলিনী, যাকে আমরা কমল বলে ডাকি, না, না, আমরা শুরু করিনি, বিশ্বনাথের দেওয়া নামও নয়, মেয়েরাই দিয়েছিল। এ-সব ওদেরই কীর্তি, মেয়েরাই মেয়েদের নামগুলোকে ভেঙে দুমড়ে বদলে দিত। অথবা ছেলে-ছেলে নাম করে ছাড়ত। যেমন নন্দিনীকে নন্দু। এভাবে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে চাইত কিনা কে জানে।

বিরক্ত হয়ে চলে আসতে চাইছিলাম।

দাদু ছেড়ে দেবার পাত্র নয়।

বলল, শোনো, মানিক শোনো, এত রাগ করছো কেন?

ছোট ছিলাম যখন, দাদু ঠাকুমা দু'জনেই আমাকে 'তুই' বলত, কবে থেকে যে ওদের কাছে 'তুমি' হয়ে গেলাম মনেও পড়ে না।

দাদু হাসতে হাসতে বলল, এতে রাগ করার কী আছে, গার্লফ্রেন্ড থাকবে, ভাব-ভালবাসা হবে, বিয়ে করবে, সংসারধর্ম। ও তো পাতা রেললাইনের মতো ব্যাপার, গড়গড় করে গাড়ি চলবে। এর নামই জীবনধর্ম।

দাদুর দার্শনিকতায় হেসে ফেললাম, রাগ চলে গেল।

তারপর হাসতে হাসতেই বলল, পিতৃধর্মও বলতে পারো।

ব্যাপারটা একটু দুর্বোধ্য লাগল।

চোখ দেখেই বোধহয় দাদু বুঝতে পারল।

হাসতে হাসতে বলল, তোমার বাবাও তো গার্লফ্রেন্ডকেই বিয়ে করেছে। বাবার বিয়ের কথা শুনতে কার ভাল লাগে। এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলাম। দাদু কিন্তু নাছোড়বান্দা।

গম্ভীর হয়ে গিয়ে গলার স্বর নামিয়ে বলল, ওরাও তো স্বাভাবিক মানুষ রে বাবা।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে : একই স্কুলে, হ্যাঁ ওদের স্কুলে, একসঙ্গে পড়তে শিখছে, লিখতে শিখছে। একটু বেশি বেশি বন্ধু হয়ে যাওয়া তো দোষের নয়। ওদের স্কুল ছাড়ার পরেও আমাদের দু'বাড়িতে যাতায়াত ছিল। তোমার মা তখন ফুটফুটে সুন্দর, মায়া পড়ে গিয়েছিল।

আমি বলে উঠলাম, মা এখনও সুন্দর। জানো তুমি? সেই যে বিয়েবাড়িতে গিয়েছিল একবার, ঠাম্মার গিনিহার পরে, সবাই বলছিল রানির মত দেখাচ্ছে। কত ছোটবেলার কথা, এখনও মনে আছে।

দাদু ঘাড় নেড়ে নেড়ে যেন আমার কথা স্বীকার করে নিল।

বলল, প্রোপোজালটা এসেছিল তোমার মামাবাড়ি থেকে, সুশানকে জিগ্যেস করে বুঝলাম, ওরও পছন্দ। ব্যস্।

দাদুর কাছ থেকে চলে আসার পর বুঝতে পারলাম, আমি বাবা-মাকে এখনও আগের মতোই ভালবাসি। তা না হলে দাদুর কথার পিঠে বলে বসব কেন, মা এখনও সুন্দর। তবু বুকের মধ্যে কেমন একটা কাঁটার মতো বিঁধে আছে। এক একসময় রাগও হয়, ওদের ওপরেই। কাউকে বলতে পারি না বলে। অথচ দোষ তো ওদের নয়। ভাগ্যের।

নন্দিনী যে আমাকে ফোন করেছিল, সমীর আর বিশ্বনাথের কাছে চেপে গেলাম।

পরের পরের দিন কলেজে নন্দিনী এমন ভাব দেখাল যেন আমাকে চেনেই না। ভীষণ রাগ হল ক্যান্টিনে অম্লানের পাশে বসে চিকেন রোল খেতে খেতে হেসে হেসে গল্প করছে দেখে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, তুমি যদি অম্লানের গার্লফ্রেন্ড হতে চাও, আমার কিছু যায় আসে না।

ক্যান্টিন থেকে বেরিয়ে ক্লাশের দিকে যাচ্ছি, নন্দিনী ততক্ষণে অম্লানকে ছেড়ে মেয়েদের ভিড়ে মিশে গেছে।

হঠাৎ দেখি ও কখন একেবারে আমার পাশে।

চাপা গলায় : এই, ফোনের কথা কাউকে বলনি তো?

চমকে গিয়েছিলাম। বললাম, না।

বলা যায় নাকি। ওরা তাহলে ক্ষেপিয়ে মারবে।

সেদিন বাড়ি ফেরার পথে মনে হল বুকের কোণে ওই যে একটু ভ্যাকুয়াম হয়ে যাওয়ার কথা বলেছি, সেটা পূর্ণ হয়ে গেছে। ভরাট। নিছক আনন্দে।

আপনি তো এত এত চরিত্রের মনের কথা লিখেছেন, আপনি হয়তো সবই বুঝতে পেরেছেন, জানতে পেরেছেন। সেজন্যে আমার কথা পড়তে পড়তে আপনার পক্ষে অধৈর্য হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। তবু আমার একান্ত অনুরোধ আমার জীবনের কথা ধৈর্য ধরে একটু শুনুন। হয়তো আমিও আপনার উপন্যাসের চরিত্র হয়ে যেতে পারি।

সেকেন্ড ইয়ারের পরীক্ষা হয়ে গেল। বেশ কয়েকদিন ছুটি।

ছুটির পর কলেজে এসেছি, ক্লাশে ঢুকছি।

নন্দিনী কোত্থেকে ছুটে এল, প্রায় জাপটে ধরে আর কি। হাত বাড়িয়ে...।

আমাকেও হাত বাড়াতে হল। হ্যান্ডশেক।

তারপরই! কংগ্র্যাচুলেশন।

হেসে ফেলে বললাম, কেন?

ও বলল, দেখনি?

তারপরই : ইউ হ্যাভ টপড্ দি লিস্ট।

ভীষণ আনন্দ হল। টাঙিয়ে দিয়েছে?

স্বচক্ষে না দেখে শান্তি নেই। আগের বছর অম্লান এক নম্বরে ছিল। এসব রেজাল্টের কোনও আসল দাম নেই, ফাইনালে যোগ হবে না। তবু, আত্মবিশ্বাস তো বাড়ে, প্রোফেসররা একটু বিশেষ চোখে দেখেন, সহপাঠীরাও।

নন্দিনীর চোখেও বিশেষ হয়ে ওঠার কথাই বা বাদ দিচ্ছি কেন।

নন্দিনী বলল, চলো চলো, দেখবে চলো।

নিজের চোখেই দেখলাম।

ওর এত আনন্দ দেখে সাহস বেড়ে গেল। সিড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে বললাম, এখানে তো এক নম্বরে। তোমার লিস্টে কত নম্বর? হোয়ের ডু আই স্ট্যান্ড?

অট্টহাস হেসে গড়িয়ে পড়ে আর কী?

বলল, সে লিস্টে নামই নেই।

হাসতে হাসতেই বলল, ইউ ডু নট স্ট্যান্ড এনিহোয়ের, ইউ আর জাস্ট নীলিং বিফোর মি। লাইক আদার্স।

বলার হক আছে নন্দিনীর। এমন কিছু রূপসী নয় ও, দুরন্ত রেজাল্ট দেখানো মেয়েও নয়, কিন্তু ওর চেহারা-চরিত্রে-ব্যবহারে কোথাও এমন কিছু আছে যে সকলেই আকৃষ্ট হয়। কী আছে? আমি খুঁজে পেতাম না। আলগা শ্রী, একটা চটক, কিংবা সপ্রতিভ উচ্ছল কথাবার্তা? প্রথম প্রথম সকলেই ওকে এড়িয়ে চলার চেষ্টা করত, বোধহয় এগিয়ে গিয়ে আলাপ করার সাহসই পেত না। সে সুযোগই দিয়েছে নাকি কাউকে। কে যেন বলেছিল, শি ইজ আনপ্রেডিকটেবল। কথাটা মিথ্যে নয়। তখনই মেয়েদের দলে গিয়ে হাসি তর্ক হল্লায় এমন মজে অফ পিরিয়ড কিংবা ক্যান্টিনে টিপিন আওয়ার কাটিয়ে দিয়েছে যে, এখানে ওখানে যে ছেলেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তাদের অস্তিত্বই যেন উপেক্ষা করছে। আবার তখনই ছুটতে ছুটতে গিয়ে অশোক কিংবা অনিমেষের কাঁধে হাত রেখে হাঁটতে শুরু করেছে। গোড়ার দিকে মেয়েদের কেউ কেউ ওকে নিয়ে একটু-আধটু বাঁকা কথা যে বলত না, তা নয়। ছেলেরাও ছেড়ে দেয়নি নিজেদের মধ্যে ফিসফাস উপহাসে। কিন্তু একদিন সব বন্ধ হয়ে গেল, সবাই বুঝে গেল ওটা নন্দিনীর স্বভাব। খোলামেলা, যা মুখে আসে বলে দেয়, কোনও বিশেষ ছেলের দিকে ওর পক্ষপাতিত্ব নেই, কাউকে নাচিয়ে বেড়াচ্ছে না। উল্টে সারা ক্লাশই ওকে ঘিরে নাচছে।

বিশ্বনাথ বিজ্ঞের মতো বলেছিল, আসলে ও নিজেই নাচছে।

কিন্তু বেশ টের পেতাম অনেকেই ওর কাছে আসতে চাইছে, অন্তরঙ্গ হতে চাইছে। অন্য কারও সঙ্গে নন্দিনীকে বেশি মাখামাখি করতে দেখলে বুকের ভেতরটা টনটন করে উঠত। নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করতাম, তাহলে কি আমি ওর প্রতি দুর্বল হয়ে পড়েছি?

ভালবেসে ফেলেছি? প্রেম?

আমি কি ছাই আগে প্রেম করেছি, যে সেটা কি বস্তু জানবো। ভাল লাগে, ওর সঙ্গে কথা বলতে, মিশতে। তা বলে...।

ওই যে প্রশ্ন করেছিলাম, তোমার লিস্টে কত নম্বর, সেও তো নিছক ইয়ার্কি।

কিন্তু ও যে জবাবটা দিল, বুকে লাগল।

ইগো তো আমাদের সকলেরই আছে। তাতে আঘাত লাগলে কষ্ট পাই, রাগ হয়।

আমি যেচে ওর সঙ্গে আলাপ করতে যাইনি, নন্দিনীই এসেছে। ওর সঙ্গে গিয়ে আলাপ করায় সকলেরই আড়ষ্টতা ছিল, কিন্তু ও নিজেই গিয়ে এমনভাবে মিশেছে যে কেউ আর দূরে থাকতে পারেনি। যতক্ষণ না ও আবার তাকে দূরে ঠেলে দিয়েছে।

বলল কিনা, ইউ আর জাস্ট নীলিং বিফোর মি।

নীল ডাউন হয়ে ওর কাছে প্রার্থনা করছি। ও কি নিজেকে গডেস ভাবছে। আমার কোনও আত্মসম্মান নেই? আমি কি ওর কাছে প্রেম ভিক্ষে করছি নাকি? স্রেফ ভাল লাগে, সঙ্গ পছন্দ করি, কথা বলতে ইচ্ছে করে। ও একদিন ক্লাশে না এলে মনে হয় মহাশূন্যে ভেসে বেড়াচ্ছি, কাউকে ভাল লাগে না, কিছু ভাল লাগে না। কলেজে এসেও ও যদি অনেক দূরে বসে থাকে, সারাদিন অন্য কারও সঙ্গে জমে গিয়ে থাকে, তবু ওর অস্তিত্বটুকুই যেন শান্তি। একটু জ্বালা জ্বালা শান্তি। ছুটির পর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেলেও।

ওই যে বললাম, আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছিল, সারা দিনে একবারও ওর দিকে তাকাইনি, সমীর আর বিশ্বনাথকে নিয়ে একটু বেশি বেশি হুল্লোড় করেছি।

ছুটির পর ইচ্ছে করেই পিছিয়ে পড়েছিলাম।

মেয়েদের দলে মিশে গিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে, যাক না।

হঠাৎ দেখি ও উল্টো মুখে কাকে খুঁজতে খুঁজতে পিছিয়ে আসছে। সঙ্গে মৌসুমি। অর্থাৎ মনসুন।

আমাকে দেখতে পেয়েই : হাই।

এসেই বলল, চলো ফুচকা খাব।

আমাদের ক্যাম্পাসের ভেতরে ফুচকাওয়ালা চানাচুরওয়ালার ঢোকা বারণ।

তাই গেটের বাইরে ওরা সারি দিয়ে দাঁড়ায়।

ক্যান্টিনে যতই সাবসিডি দিক, সস্তায় ভাল খাবার পাওয়া যাক, রোজ রোজ একই খাবারে একটু অতৃপ্তি তো থাকেই। তাই গেট থেকে বেরিয়ে অনেকেই ওদের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ে।

আমার মুখ তখনও থমথমে, ওকে দেখে আরও।

ফুচকার প্রোগ্রাম শুনে আমি না না না করে উঠলাম।

মৌসুমি ধমক দিল, কী হচ্ছে কি, সিন ক্রিয়েট করিস না, চল।

অগত্যা যেতেই হল। মনে একটা প্রশ্ন জাগল ও কী মৌসুমিকে সব বলেছে? আঘাত পেয়েছি জেনে পরামর্শ করে রাগ ভাঙাতে এসেছে।

মনে মনে ঠিক করলাম নিজেই পয়সা দেব, ওদের দিতে দেব না।

এখন আর ভয় নেই। কোনওদিন মুখ শুকনো দেখলেই মা ভাবত পয়সার অভাবে দুপুরে ঠিক মতো খাওয়া হচ্ছে না, আমি নাকি শুকিয়ে যাচ্ছি। তখন শুনতাম, দাদুর কাছেই, ওদের বুটিক নাকি বেশ ভাল চলছে।

তার প্রমাণ পেলাম হাতে হাতে।

বাবা মাসে মাসে একশো টাকা করে পকেট-মানি দিতে শুরু করল, আর মা গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে ইশারায় চোখের দৃষ্টিতে জানাল, ভাল করে খাবি।

কিন্তু সে পয়সার কিছুটা চলে যেত সিগারেটের পিছনে। পান কিংবা এলাচ খেয়ে বাড়ি ফিরতাম। অবশ্য ধরা পড়ার ভয় ছিল না, বাবা-মা'র সামনে তো আসতামই না।

রাজি হলেও চুপচাপ ওদের সঙ্গে এলাম।

শালপাতার ঠোঙা হাতে নিয়ে দাঁড়ালাম।

একটার পর একটা ফুচকা পড়ছে ঠোঙায়, খেয়ে যাচ্ছি, কোনও কথা বলছি না। যত কথা বলছে মৌসুমি আর নন্দিনী।

—ব্যস্। নন্দিনী বলল ফুচকাওয়ালাকে।

আমি মৌসুমি দু'জনেই পয়সা বের করেছি, নন্দিনী মৌসুমিকে থামিয়ে দিল।

—রাখ। অমৃৎ দেবে।

অমৃত নামটা বোধহয় এই প্রথম শুনলাম ওর মুখে, তাও অমৃত নয় অমৃৎ।

এর মধ্যে যে কোনও অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পায় তা আমি বুঝতেও পারিনি।

আমার মনে হয়েছে ও বোধহয় মৌসুমির কাছে দেখাতে চাইছে আমার ওপর ও কতখানি আধিপত্য বিস্তার করেছে।

তাই আমার মুখ তখনও গম্ভীর। ইগোতে আঘাত দিলে কি চট্ করে ভোলা যায়।

আমরা তিনজনে এসে বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়ালাম।

মৌসুমির বাস আসছে, এসে দাঁড়াল।

—থ্যাঙ্কু ফর দ্য ফুচকা। হেসে বলল মৌসুমি। বাসে উঠে গেল।

আর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে দাঁড়িয়ে আমার চোখে চোখ রেখে নন্দিনী বলে উঠল, আর মুখ থমথমে করতে হবে না। বী ইজি।

এবার হেসে উঠে বলল, আরে বাবা। আমার কোনও লিস্ট নেই, যদি বা থাকত, তাতে একটাই নাম। তুমি, তুমি তুমি।

ওর বাস এসে গেল, কিন্তু উঠতে চাইল না। আমার বাস এসে গেল,

উঠতে দিল না।

ফুটপাথ ধরে হাঁটছে। খুব ধীর পায়ে। আমিও।

দু'একটা খুচরো কথাবার্তা। ওর কোনও একটা কথায় হেসেও ফেললাম। বেশ হাল্কা লাগছে নিজেকে।

হঠাৎ বলে ফেললাম, তুমি আজ কিন্তু আমাকে ভীষণ কষ্ট দিয়েছ।

—আমাকে দাওনি। সেই যেদিন তোমাকে ফোন নম্বর দিলাম, সারাদিন অপেক্ষা করে আছি, তুমি একবারও ফোন করলে না। শেষে আমিই করলাম, কোনও কথাই বললে না।

আমার বুকের মধ্যে তখন তোলপাড় চলছে, হাওয়ায় ভাসছি। প্রেম কী জানতাম না, ভালবাসা কী জানতাম না। সে দিনই প্রথম যেন অনুভব করলাম। স্বীকৃতি, আমার ইগোকে যেন স্বীকৃতি দিয়েছে নন্দিনী, সন্তুষ্ট করেছে।

নন্দিনী হঠাৎ হেসে উঠে বলল, সেদিন কে ফোন ধরেছিলেন, তোমার বাবা? সেজন্যেই কোন কথা বলতে পারোনি, তাই না?

আমি ছোট্ট করে বললাম, না দাদু।

সুযোগ ছিল, তবু বলতে পারলাম না। ওই একটা ব্যাপারেই আমার সঙ্কোচ, আমার ভয় দ্বিধা।

গাছের ঝরাপাতার মতো হাল্কা হাওয়ায় উড়তে উড়তে আমি বাড়ি ফিরে এলাম। মনে প্রগাঢ় ফূর্তি। একটি মেয়ে, যাকে নিজেরই অজান্তে ভালবেসে ফেলেছি, তার মন পাওয়ার মধ্যে যে এত আনন্দ, কে জানত।

আমরা দু'জনে যে কতক্ষণ ফুটপাথে পায়চারি করেছি, গল্প করেছি, আমরা টেরও পাইনি। হাতের ঘড়িটা দেখতে ইচ্ছেও হয়নি। ওটা দাদু কিনে দিয়েছিল।

অনেক দেরি হয়ে গিয়েছিল। নন্দিনী বাড়ি ফিরে বকুনি খাবে না তো!

ফিরে এসে দেখি বাবা-মা এসে গেছে। ওরা বুটিক বন্ধ করে দেরি করেই ফেরে। না ফেরা অবধি ঠাকুমা দুর্ভাবনায় থাকে।

ঠাকুমা দরজা খুলে দিল।

আমাকে ঢুকতে দেখেই মা চোখে উদ্বেগ নিয়ে তাকাল আমার দিকে। হাতের আঙুলের প্রশ্ন : কী হয়েছিল? এত দেরি কেন? শরীর ভাল?

মায়ের উৎকণ্ঠা দূর করে জানালাম, কিছু হয়নি, আমি ভাল আছি, আমি ভাল আছি।

সত্যি তাই। এত ভাল আমি কোনওদিন ছিলাম না।

বাবা তার হিসেবের খাতা নিয়ে গিয়ে দাদুকে দেখাচ্ছে। ওদের খুব খুশি খুশি লাগছে।

আমি একবার উঁকি দিতে গেলাম।

দাদু আমাকে দেখে মাথা তুলে বলল, বুটিক খুব ভালই চলছে রে অমু।

অর্থাৎ টাকা আসছে।

অথচ আমি ওটাকে ভুলে থাকতে চাই। আফটার অল একটা দর্জির দোকান। বন্ধুদের কাছে বলাও যায় না।

আসলে ছেলেবেলা থেকেই দেখে আসছি, মায়ের একটা সুন্দর রুচি আছে। ঠাকুমার বয়েস হয়েছে বলে এখন আর খাটার ক্ষমতা নেই। এসব দিকে ঝোঁকও ছিল না। মা জীবনটাকে সুন্দর করার চেষ্টা করত। বাবাকে সঙ্গে নিয়ে দোকানপাট ঘুরে ঘুরে টুকিটাকি নানা জিনিস কিনে এনে ঘর সাজাত। সাজিয়েছিল।

ওই রুচিজ্ঞানই মায়ের আসল পুঁজি। একটু আধটু ছবিও আঁকতে পারত।। নয়, ছবি আঁকতে পারত বলা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। পেনসিল ড্রয়িং। খচখচ পেনসিল টেনে একটা ফ্রক, কিংবা শালোয়ারের কুর্তা, ব্লাউজ এঁকে ফেলত দোকান ঘুরে, ঘুরে, তারপর মাথা খাটিয়ে একটা নতুন ডিজাইন বানাত। নিজেই কাপড়ের রঙ বেছে আনত, কাঁচি নিয়ে ঝটপট কাপড় কেটে দর্জির হাতে তুলে দিত। ইশারায় বুঝিয়ে দিত তাকে। বুঝতে না পারলে শম্ভুদা বুঝিয়ে দিত। কারণ, কাজ করতে করতে শম্ভুদা দিব্যি বাবা-মা'র কথা বুঝতে পারত।

হিসেবের খাতা দাদুর কোলে, চোখ তুলে হাসি ছড়িয়ে দাদু বলল, ব্যবসা বেড়ে গেলে বুটিক কে সামলাবে রে অমু।

একটু থেমে, তোর তো এখনও দু' বছর বাকি।

আমি অবাক। দাদুর ওপর রেগে গেলাম। কিছু বললাম না। ওরা কি ভেবেছে আমি ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে এসে এই দোকান দেখব? আই হেট দিস বুটিক। কারও কাছে গর্ব করে বলা যায় না।

এই যদি তোমাদের মনের বাসনা ছিল তা হলে আমাকে পড়াতে গেলে কেন? এত রেজাল্টের পিছনে ছুটছি কেন? আই ওয়ান্ট টু বি সামবডি। আমার নিজস্ব একটা আইডেনটিটি গড়ে তুলব। আমি আমি হব। কারও ছেলে নই, কারও নাতি নই। বুটিক আমার পরিচয় হতে পারে না। আমি এসব থেকে মুক্তি চাই। পাশ করার পরই চাকরি। প্রয়োজন হলে চাকরি নিয়ে চলে যাব। বাবা-মা, দাদু-ঠাকুমা, এরা আমার কেউ নয়। এরা সবাই আমাকে ওদের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রাখতে চায়। সারা জীবন।

আপনি নিশ্চয় আমার কথাগুলো বুঝতে পারবেন। অন্যেরা আমাকে স্বার্থপর ভাববে। অকৃতজ্ঞ ভাববে। তাদের মনে হবে বাবা-মা'র প্রতি, দাদু-ঠাকুমার প্রতি আমার ভালবাসা উবে গেছে। সে জন্যেই নিজে লিখতে চাইনি, আপনাকে অনুরোধ করেছি আমার জীবনকে আপনার কলমে প্রকাশ করুন। আমার যন্ত্রণা। আমার ক্ষোভ।

শুধু নন্দিনীকে নিয়ে আমার আর কোনও যন্ত্রণা ছিল না, কোনও ক্ষোভ ছিল না।

দুজনেই কলেজের পড়া নিয়ে মেতে উঠলাম। একটাই লক্ষ্য : ভাল রেজাল্ট। দুজনেরই। সহপাঠীদের কারওরই আর তোয়াক্কা করি না, যে যা ভাবে ভাবুক। আমাদের সম্পর্ক আমাদের নিজস্ব এবং গোপন। লাইব্রেরিতে বসে ক্লাস লেকচার নিয়ে আলোচনা নন্দিনী কিছু মিস করলে, তাকে বুঝিয়ে দিই, লাইব্রেরি থেকে কোনও বই নিয়ে গিয়ে কী কী পড়তে হবে বলে দিই। আমি কোনওদিন আসতে না পারলে নন্দিনী তার নোটস-এর খাতা আমাকে দিয়ে দেয়, কপি করে নিও।

সে বড় সুখের দিন।

সমীর একদিন ঠাট্টা করে নন্দিনীকে বলল, কী ব্যাপার রে নন্দু, তুই শেষে মুর্দাটার সঙ্গেই জমে গেলি নাকি? তোর তো দেখাই পাই না।

সঙ্গে সঙ্গে ও হেসে উঠে সমীরের কাঁধে হাত : চল তা হলে আজ তোর সঙ্গেই জমে যাই। পিছন ফিরে আমার দিকে একটা চোখের ইশারা ছুঁড়ে দিল। অর্থাৎ ডোন্ট মাইন্ড।

আসলে আমাদের সম্পর্কটা আমাদের কাছে এতই পবিত্র মনে হত যে তা ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানাতে ইচ্ছে হত না। অথচ বুকের মধ্যে একটা গর্ব, ইচ্ছে হত সবাইকে জানিয়ে দিই। আমরা পরস্পরকে ভালবাসি, ভালবাসি।

ছুটিছাটা থাকলে বাড়িতে বসে থাকতে ইচ্ছে করে না। আগে থেকে প্ল্যান ঠিক হয়ে যায়, কোথায় কখন দেখা করব। প্ল্যান ভেস্তে গেলে নন্দিনী ফোন করে জানায়, ক্যানসেলড। মন-মেজাজ নষ্ট হয়ে যায়, সেদিন আর পড়তে বসতে ইচ্ছেই করে না।

প্রেম তো শুধু মন দেওয়া-নেওয়া নয়, তারও অন্তঃস্থলে থাকে আর একটা লোভ।

দুজনে সিনেমা দেখতে গেছি, পাশাপাশি, অন্ধকারে, আমার হাত ওর কাঁধে, চঞ্চল আঙুলের ভাষা ও বোধহয় পড়তে পারল, বাঁ হাতের মুঠোয় শক্ত করে ধরে রইল আমার হাত। আমি হাত সরিয়ে নিলাম। ও কাছ ঘেঁষে এল, আমার হাতের সমান্তরালে ওর হাত রাখল, ঘন স্পর্শ দিয়ে।

এভাবেই থার্ড ইয়ারও পার হয়ে গেল। আমি আবার এক ধাপ নেমে গিয়েছি, নন্দিনী অনেকখানি ওপরে উঠেছে। ওর মুখে পরীক্ষার পড়া ছাড়া আর কোনও কথা নেই। তবু ফাঁক পেলেই কোথাও না কোথাও চলে যাই। নিতান্তই সাদামাটা কথা, কথার পিঠে কথা। তবু কী শান্তি। একদিন ও ক্লাসে না এলে ভিতরে ভিতরে ছটফট করি, উদ্বেগ হয়।

ছুটির পরেই কাছাকাছি কোনও বুথ থেকে ফোন করি।

ওর মা ধরেন। —অমৃত? ধরো দিচ্ছি, ওর তো জ্বর।

ফোন করার ভয় ভাঙিয়ে দিয়েছিল নন্দিনী। —আরে বাবা, আমাদের

বাড়ি অত কনজার্ভেটিভ নয়। করেই দেখ না, ক্লাশের কত ছেলেই তো করে।

বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে উঠেছিল। আরও অনেকে ফোন করে! কে, কারা? জানতে ইচ্ছে হয়েছিল, জিগ্যেস করতে পারিনি। কারণ তা হলেই তো ওর কাছে আমি ছোট হয়ে যাব।

কলেজে সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছি। পারিনি। তাদের কারও কারও সঙ্গে কি নন্দিনী সিনেমা দেখতেও যায়? এখানে ওখানে বেড়াতে? আমাদের মতোই নির্জনতায় ঘাসে বসে চিনেবাদাম ভাঙে, ঘাসের শিস কাটে দাঁতে। নন্দিনীর দাঁতের সারি ভারি সুন্দর, হাসলে চমক দেয়। মুগ্ধ হয়ে দেখি।

শরীরের স্পর্শ এক ধরনের স্বীকৃতি। ও কি আর কাউকে ওর শরীর স্পর্শ করতে দিয়েছে?

এভাবেই কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো।

ফাইনাল পরীক্ষা এগিয়ে এল।

একদিন হঠাৎ বলল, বাড়িতে চল, বাড়িতে চল। অনেক দাগ দিয়ে রেখেছি বুঝে নিতে হবে।

আমি ভেবেছি আমাদের বাড়িতে যাবার কথা বলছে। আমি কী একটা অজুহাত দিতে যাচ্ছিলাম।

নন্দিনী বলে উঠল, আরে না না, আমাদের বাড়ি যাবার কথা বলছি।

ওরে বাব্বা। আমি ভয় পেয়ে গেলাম।

নন্দনী বলল, মা-বাবা মোটেই বাঘ-ভালুক নয়।

ও কথায় কথায় ওর মা-বাবার প্রসঙ্গ টানে। আমি পারি না। আমি কেবলই এড়িয়ে যাই। তেমন কিছু বলতে হলে বরং দাদু-ঠাকুমার কথা বলি। ও অতশত লক্ষ্যও করে না।

একদিন সত্যি সত্যি ওদের বাড়ি যেতে হল।

ওর বাবা ছিলেন না।

মা এসে দরজা খুলল।

—এই তোমার অমৃৎ। নন্দিনী হাসতে হাসতে বলল।

—ওমা, তুমি। এত ভালমানুষ ভালমানুষ চেহারা আমি ভাবিইনি। এসো, এসো। আমি ভেবেছিলাম, চুমকির মতোই ডানপিটে টাইপ।

আমি লজ্জিত ভাব করছি, না কি সত্যি লজ্জা পাচ্ছিলাম জানি না।

আমরা গিয়ে নন্দিনীর পড়ার ঘরে ঢুকলাম।

ওর মা এসে সুন্দর দুটো প্লেটে কী সব খাবার দিয়ে গেলেন। কী চমৎকার নকশা করা কাচের গ্লাসে জল।

—ফ্রিজের ঠাণ্ডা মিশিয়ে দিয়েছ?

মা ঘাড় নাড়লেন। আমাকে দেখছেন, ঠোঁটে কৌতুকের হাসি।

ওর মা চলে যেতেই মাথায় ঘুরছে চুমকি নামটা। এতদিন গোপন রেখেছিল কেন! বেশ সুন্দর নাম। আগে জানলে আমি ওই নামেই ডাকতে পারতাম।

আমি নন্দিনীকে সারাক্ষণ পড়া বোঝালাম। ওর মা আর একবারও ঘরে এলেন না, উঁকি দিলেন না।

যাবার সময় : কেমন দেখলে? বাঘ না ভালুক?

বললাম, সো নাইস। অমন মা পাওয়ার জন্যে ইউ আর লাকি।

নন্দিনী আমাকে বাস স্টপ অবধি এগিয়ে দিতে এসেছিল। ও হেসে উঠল।

বাড়িতে ফিরে বলেছিলাম, এক বন্ধুর সঙ্গে পরীক্ষার পড়া নিয়ে কনসাল্ট করছিলাম।

গার্লফ্রেন্ড কিনা দাদু জিগ্যেস করেনি।

এর পর আর একটা দিনের কথাই স্পষ্ট মনে আছে।

বর্ষার দিন। অথচ সেদিন বৃষ্টি নেই। তেমন রোদ্দুরও নেই, বেশ কোমল আবহাওয়া। তার ওপর রবিবার। এমনিতেই বাড়িতে আটকে থাকতে ইচ্ছে করে না, আটকে থাকার বয়েসও নয়। বাইরে বেরিয়ে গিয়ে কোনও বুথ থেকে জানালেই হল, নন্দিনী নির্ঘাৎ চলে আসবে। ওর ওপর আমার বেশ আধিপত্য এসে গেছে। ও চেষ্টা করে কলেজে অন্যদের সঙ্গে আগের মতো মাখামাখি না করার। কারণ আমার ভাল লাগত না, অসহ্য লাগত।

একদিন বলেই ফেলেছিলাম, ছেলেদের ওপর তুমি অমন ঝাঁপিয়ে পড় কেন?

হেসে উঠে বলে কিনা, তা দেখে তুমি ঠোঁট ফোলাবে সেই লোভে।

এ মেয়ের ওপর রাগ করা যায়। আমি হেসে ফেলেছিলাম।

একদিন ওর পড়ার ঘর থেকে বেরিয়েছি, বেশ অন্ধকার হয়ে গেছে, টেরই পাইনি ওর বাবা কখন ফিরে এসেছেন।

ড্রয়িং রুম পার হয়ে বেরোতে হয়, দেখি ওর বাবা ড্রয়িং রুমের কুশন চেয়ারে বসে কী একটা ছবির ম্যাগাজিনে চোখ রেখে চা খাচ্ছেন।

আমাদের দেখে চোখ তুলে তাকালেন। নির্বিকার মুখ।

নন্দিনী বলল, অমৃৎ। ওকে অমৃত উচ্চারণ করাতে পারিনি।

ওর বাবা আপাদমস্তক দেখলেন আমাকে, একটা পেন্নাম ঠুকে দেওয়া দরকার কিনা ভাবছি, ওর মাকে দ্বিতীয় দিন করেছিলাম। একেবারে ভিজে গিয়েছিলেন। একটু অস্বস্তি লাগল, পারলাম না।

আমাকে দেখলেন, না পর্যবেক্ষণ করলেন বুঝলাম না।

গলা একটু গম্ভীর : ফ্রেন্ড কি রকম পড়াশোনা করছে, ফার্স্ট ক্লাশ পাবে তো?

বললাম, কেন পাবে না, মন দিয়ে পড়লেই পাবে।

—সেটাই তো মুশকিল, যা আড্ডাবাজ।

নন্দিনী হেসে উঠল।

আমরা বেরিয়ে এলাম, নন্দিনী চিৎকার করে শোনাল, আমি একটু আসছি বাপি। আরও জোরে চিৎকার করে, মা আসছি।

মা নিশ্চয় ভেতরে বাপির সান্ধ্য আহারের ব্যবস্থা করছেন।

ধীর পায়ে হেঁটে চলেছি বাসস্টপের দিকে। নন্দিনী বলল, তুমি চলে যাওয়ার পর এত খারাপ লাগে, পড়ায় মন বসে না।

হাসতে হাসতে : শুধু তোমার কথা ভাবি।

তারপরই হঠাৎ : এই, তুমি প্রথম কবে থেকে...

—কবে থেকে...—কী?

আমার হাতের পাঁচ আঙুলের সঙ্গে ওর পাঁচ আঙুল। একটু চাপ : আহা বোঝেন না যেন।

বললাম, তুমি?

নন্দিনী হেসে উঠল। বলল, প্রথম দিনই। আমি জিনস আর টি-শার্ট পরে গিয়েছি, তুমি বার বার তাকাচ্ছো। আই ফেল্ট প্রাউড। বোধহয় সেদিন থেকেই।

কথাগুলো শুনে আমারই বরং গর্ব হল।

নন্দিনীর মুখে স্মিত হাসি।

বলল, কি অদ্ভুত দেখ। কেউ মুখ ফুটে কিছু বলিনি, অথচ দুজনেই জানতাম। বুঝতে পেরেছিলাম।

বললাম, তবু তো অন্যদের সঙ্গে গায়ে পড়া ভাব করে আমার বুকে জ্বালা ধরিয়ে দিতে।

—তা তোমাকে জ্বালাবার জন্যেই।

তারপর হঠাৎ বলল, মানুষ মুখের কথায় কতটুকু বা বলতে পারে? চোখের ভাষাই আমাদের আসল ভাষা। চোখ দিয়ে আমরা সবকিছু বলতে পারি।

ঠিক সেই মুহূর্তে একটু ঘনিষ্ঠ হওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। উপায় ছিল না। বাস স্টপের কাছে এসে গেছি, বেশ ভিড়।

তারপর সেই বর্ষার দিন। রবিবার। কী করি, কী করি ভাব।

হঠাৎ বিকেলের দিকে ফোন।

দাদু বলল, অমু, তোমার সেই গার্লফ্রেন্ড।

দাদুর মুখে কৌতুকের হাসি।

আমি ফোন ধরলাম। নন্দিনী বলল, চট করে চলে এসো. অ্যাকাডেমিতে একটা ছবির এগজিবিশন, এইমাত্র কাগজে দেখলাম।

—ঠিক আছে।

আমি এই রকম একটা ডাকের অপেক্ষাতেই ছিলাম। ভাবছিলাম বেরিয়ে গিয়ে আমিই ফোন করব কিনা।

অনেকক্ষণ ধরে ঘোরাঘুরি করলাম, ছবি দেখলাম। ওটা আসলে একটা উপলক্ষ্য। চাইছি কাছাকাছি পাশাপাশি থাকতে, সামনাসামনি কথা বলতে।

পিছনে একটা খাবারের দোকান আছে। গরম গরম সিঙাড়া ভাজে। গিয়ে কিছু খেয়ে আসব কিনা ভাবছি। কেটলি হাতে চায়ের বাচ্চাটা ঢুকল।

বললাম, চল গরম সিঙাড়া খেয়ে আসি। চা।

দুজনে খেয়ে এসে অন্য ঘরটায় ঢুকলাম।

সন্ধে হয়ে এসেছে।

নন্দিনী বলল, চল যাওয়া যাক।

একটি নারী শরীরের খোলামেলা ছবি দেখতে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল নন্দিনী।

আমি পাশে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছি। বলে ফেললাম, ধুস।

নন্দিনী সঙ্গে সঙ্গে আপত্তি জানাল। —কেন? আফটার অল আর্ট ইজ আর্ট।

আর্ট হোক বা না হোক, দেখতে ভালই লেগেছিল আমার। শুধু নন্দিনীকে খুশি করার জন্যেই হয়তো বলে ফেলেছিলাম 'ধুস্'।

আমি তো জানতাম মেয়েদেরই এসব ছবি খারাপ লাগে।

আমরা দু'জনেই বেরিয়ে আসব, আরও অনেকে বেরিয়ে যাচ্ছিল, দরজার সামনে এসে দেখি সবাই থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

উঁকি মেরে দেখি, ঝিরঝিরে বৃষ্টি। ইলশেগুঁড়ি। সবাই অপেক্ষা করছে থেমে যাবে।

বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ঠাকুমা বলেছিল, কোথায় যাচ্ছো অমু, ছাতা নিয়ে যাও।

মনে মনে হেসেছি, হাতে ছাতা নিয়ে কেউ প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে যায়!

ভিড় ঠেলে নন্দিনী ক্রমশই এগিয়ে চলেছে, অগত্যা আমাকেও যেতে হচ্ছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করেই নন্দিনী ভিড়কে পরোয়া না করে বলল, এই চল একটু ভিজব। আঃ কতদিন বৃষ্টিতে ভিজিনি।

ঝিরঝিরে বৃষ্টি তো, আমারও ভিজতে ইচ্ছে হল।

বেরিয়ে পড়লাম দুজনে। বৃষ্টি লাগছে গায়ে, জামা ভিজছে না। বেশ লাগছিল।

নন্দিনী বলল, ওদিকে চল, বৃষ্টির সময় গড়ের মাঠ ভিক্টোরিয়া দেখতে কি যে ভাল লাগে। ছেলেবেলায় একবার দেখেছিলাম, গাড়িতে বসে।

বেশ মজা লাগছিল, হেঁটে চলেছি। সব লোক দ্রুত পায়ে ছাউনি খুঁজতে ছুটছে, আর আমরা বৃষ্টি চাইছি। ফুচকাওয়ালা ভেলপুরি সব ত্রিপল ঢাকা দিয়ে কাছাকাছি গাছের নীচে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।

আমরা গেটের দিকে হেঁটে চলেছি।

গেটের কাছাকাছি, বৃষ্টি বাড়তে শুরু করল।

বললাম, চল, একদম ভিজে যাবে।

নন্দিনী হেসে উঠে বলল, একদম ভিজতেই তো এসেছি। দু হাত ওপরে তুলে যেন বৃষ্টিকে উপভোগ করতে চাইল।

সামান্য একটা ঝটকা ঝড়, তারপর তুমুল বেগে বৃষ্টি। চারপাশ অন্ধকার, আলোও এসে পৌঁছচ্ছে না। এত জোর বৃষ্টি যে কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কেউ আমাদেরও দেখতে পাচ্ছে না।

নন্দিনী সম্পূর্ণ ভিজে গেছে, ওর শরীর শুধু শরীর হয়ে গেছে।

আমার মধ্যে কি যে ঘটে গেল জানি না।

মুহূর্তের মধ্যে আমি ওকে জড়িয়ে ধরলাম।

—কেউ দেখবে, কেউ দেখবে। ও আরও কিছু বলতে যাচ্ছিল।

আমি ওর কথা বলা বন্ধ করে দিলাম। এ মুহূর্তে একজন প্রেমিক যেভাবে প্রেমিকের কথা বন্ধ করে দেয়।

সম্পূর্ণ নির্জন একটা পৃথিবীতে আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে আছি। এক অলৌকিক সৌন্দর্যের মধ্যে।

সম্বিৎ ফিরতে দুজনেই ছুটতে শুরু করলাম। ছাউনি কিংবা ছাদের

*মৌসুমির বাস আসছে— থ্যাঙ্কু ফর দ্য ফুচকা*

খোঁজে। সর্বত্র মানুষের ভিড়, কোথাও তিলধারণের জায়গা নেই। শেষে রবীন্দ্রসদনের সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে একটু জায়গা পেলাম।

বৃষ্টিতে ভিজে নন্দিনীর শরীর যেন নিরাবরণ হয়ে গেছে। ভিজে চুল থেকে জল চুঁইয়ে পড়ছে, মুখে বৃষ্টির বিন্দু। সকলে দেখছে। নন্দিনীর ভ্রূক্ষেপ নেই।

ফিস ফিস করে কানের কাছে বলল, বিয়ের পরের জন্যেও তো কিছু রাখবে।

আমার সারা শরীর তখন ডালপালা মেলছে, ফুল ফোটাচ্ছে। শরীরের স্পর্শ যে কত বড় স্বীকৃতি তা নন্দিনী টেরও পেল না।

অনেকক্ষণ পরে বৃষ্টি থামল। সকলেই নেমে যাচ্ছে, আমরাও নামছি সিঁড়ি বেয়ে। কেউ কেউ ফিরে ফিরে তাকাচ্ছে নন্দিনীর দিকে। ভিজে পোশাক লেপটে আছে গায়ের সঙ্গে।

এই ভিজে পোশাকই তখন একটা সমস্যা।

বললাম, বাড়ি গিয়ে কী বলবে?

দু আঙুলে একটা তুড়ি দিল নন্দিনী। —কি আবার, ভিজে গেছি, ব্যস। তোমার মতো একটা ডাকাতের হাতে পড়েছিলাম তা বলব না।

আমি হেসে উঠলাম।

একটা খালি ট্যাক্সি যাচ্ছিল, ঝট করে হাত দেখাল ও, থামতেই উঠে পড়ল, হাত নাড়ল। স্পীডে বেরিয়ে গেল ট্যাক্সি।

আমার ভীষণ ভয় করতে লাগল, অনুশোচনা হল। এভাবে ওকে একা ছেড়ে দেওয়া উচিত হয়নি। দিনকাল ভাল নয়, ট্যাক্সি ড্রাইভারকেও বিশ্বাস করা যায় না। তার ওপর ওর ওই সিক্ত সৌন্দর্য।

আমি বুকের মধ্যে সেই স্পর্শ অনুভব করছি, ঠোঁটে।

দুর্ভাবনা থেকে কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করতে পারছিলাম না।

অনেকক্ষণ রাস্তায় রাস্তায় হেঁটে বেড়ালাম, কতক্ষণ জানি না। কেবলই মনে হচ্ছিল ওর সঙ্গে যাওয়া উচিত ছিল, পৌঁছে দিয়ে ফিরে আসা উচিত ছিল। পকেটে টাকাও ছিল, ট্যাক্সি ভাড়া।

কার টাকা? আমার ডেফ অ্যান্ড ডাম বাবা-মায়ের দেওয়া টাকা। যে টাকা আসে ওই বুটিক থেকে। সেটাকে আমি একটা দর্জির দোকান ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারিনি। কাউকে প্রকাশ করে বলতে পারি না। নন্দিনীকে তো নয়ই। হয়তো ওকে চিরতরে হারাবার ভয়ে।

মনে মনে কতবার বলেছি, আই হেট দ্যাট বুটিক।

হাতের ঘড়ি দেখলাম। অনেক আগেই নন্দিনীর পৌঁছে যাওয়ার কথা।

অস্থির লাগছিল।

সামনে একটা টেলিফোন বুথ দেখতে পেয়ে ঢুকে পড়লাম। নম্বর তো মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে। কতবার তো করেছি, এখন আর অস্বস্তি লাগে না।

নন্দিনীই ধরল।

জিগ্যেস করলাম, পৌঁছেছো?

হাসি। কথা বলছি কী করে।

বাই। কেটে দিলাম। কী স্বস্তি। আর কোনওদিন যেন এমন ভুল না করি।

পরের দিন সকালেই নন্দিনীর ফোন। এখন আর দাদুকে ধরতে দিই না। ছুটে গিয়ে রিসিভার তুললাম।

হ্যাঁ, নন্দিনী, বলল, প্রচণ্ড জ্বর, কলেজ যাব না। যেতে পারব না।

রেগে গিয়ে মনে মনে ভেংচে উঠলাম : বৃষ্টিতে ভিজব। ভেজো এখন।

সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ল জীবনের পরম পাওয়া ওই বৃষ্টির জন্যেই। বৃষ্টিকে ক্ষমা করে দাও।

ক্যাম্পাস সিলেকশনে একটা ভাল চাকরি পেয়ে গেলাম, এখানেই। পাব জানতাম। ফাইনালের রেজাল্ট যেমন আশা করেছিলাম, হয়তো তার চেয়েও ভাল। নন্দিনী গড়িয়ে গড়িয়ে কোনওরকমে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে। আমিই বাড়ি বয়ে ওকে খবরটা দিতে গিয়েছিলাম। তার আগেই ও ইন্টারনেট থেকে জেনে গেছে।

সব ব্যাপারে একটা মজা করা ওর স্বভাব। বলল, দেখছিলাম তুমি ফোন কর কিনা। টান আগের মতোই আছে কিনা।

আপনাকে আর বিশদ করে কিছু বলার প্রয়োজন আছে বলে তো মনে হয় না। কল্পনায় ভর করে আপনি কত কি লিখেছেন। আপনার কল্পনা দিয়েই বাকি দিনগুলোকে ভরিয়ে দেবেন। হুড়মুড় করে অনেকগুলো দিন পার হয়ে গেল। কাজে যোগ দিয়েছি। অফিস যাই। মাঝেসাঝে নন্দিনীকে ফোন করি, দেখা হয়। পরস্পরের আরও ঘনিষ্ঠ হয়েছি।

তারপর একদিন দেখা হতেই উৎফুল্ল। আনন্দ আর ধরে না নন্দিনীর।

বলল, গুড নিউজ।

ভাবলাম কোথাও চাকরি পেয়েছে।

—নো স্যার নো। চাকরি ফাকরির কে তোয়াক্কা করে, যখন হোক পেয়ে যাব।

আসল কথাটা পাড়ল। হাসতে হাসতে : বাড়িতে সব বলেছি। বাবাকে মাকে। উই ওয়ান্ট টু গেট ম্যারেড। বিয়ে করতে চাই।

আমি আঁতকে উঠলাম। বিয়ে করতে তো আমিও চাই।

বললাম, সর্বনাশ করেছে, তোমাদের বাড়ি যাওয়া বন্ধ করে দিলে।

নন্দিনী হো হো করে হেসে উঠল। আরে বাবা, ওরা রাজি, ওরা রাজি। তোমাকে একদিন যেতে বলেছেন।

সব জানানোর পর ওর বাবা-মায়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে বড়ই সঙ্কোচ। তার চেয়েও বড় কথা দাদু-ঠাকুমাকে জানাতে হবে, বাবা-মাকে। আমার ধারণা কেউ বাধা দেবে না। ওরাও সম্মতি জানাবে। ওরা সকলেই আমাকে সুখি দেখতে চায়।

সেই সময়টুকু আমার চাই।

বললাম, তোমাদের বাড়ি? পারব না, পারব না।

—বেশ বাবা বেশ। যেতে হবে না। শুধু বাড়িতে বলে একটা দিন ঠিক করে জানিও, আমার বাবা-মা যাবে।

সেই ভাল। ঠাকুমা সেকেলে মানুষ। চাইবে কন্যাপক্ষ আগে আসুক। তা না হলে ছেলের বাড়ির সম্মান থাকে না।

বেশ কয়েকটা দিন অস্বস্তির মধ্যে কাটল। কিছুতেই কথাটা দাদুকে বলতে পারছি না।

একমাত্র মাকেই বলা যেত, কত সহজে বলা যেত। অথচ মাকে বলে তো কোনও লাভ নেই। দাদু-ঠাকুমা যদি বেঁকে বসে মা সেভাবে বোঝাতে পারবে না।

নন্দিনীর কথাটা মনে পড়ল, মুখের কথায় আমরা বলতে পারি, চোখের ভাষাতেই সব বলা যায়, বোঝানো যায়।

শেষ অবধি চোখে সেই অনুনয়ের ভাষা নিয়ে দাদুর কাছে গেলাম।

একটু ইতস্তত করে দাদুকে বললাম, আমার পছন্দমতো কোনও মেয়েকে যদি বিয়ে করি তোমার আপত্তি আছে?

দাদু চমকে উঠে আমার চোখে চোখ রেখে তাকাল। স্মিত হাসি ফুটে উঠল মুখে। —সেই গার্লফ্রেন্ড? যে মাঝে মাঝে ফোন করে?

তারপর। —আমি জানতাম।

হাসতে হাসতে ঠাকুমাকে ডাকল। —শুনে যাও, শুনে যাও।

ঠাকুমাও এসে শুনল। বলল, মেয়েটাকেই তো চোখে দেখলাম না। একদিনও তো আননি।

বললাম, তোমরা গেলে তবে তো দেখতে পাবে।

ধীরে ধীরে বললাম, ওরাই আগে আসবে বলেছে।

ঠাকুমাকে খুশি করতে চাইলাম।

একটা দিন ঠিক করা হল। দাদু পাঁজির পাতা উলটে একটা দিন বলে দিলেন। বিয়ে বলে কথা, একটা ভাল দিন দেখে সূত্রপাত করা দরকার।

নন্দিনী মাঝে মাঝেই অফিসে ফোন করে। কখনও কখনও সশরীরে গিয়ে হাজির হয়। ছুটির সময় গেলে দুজনে একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ি। ভাল রেস্টুরেন্টে বসি। শপিং মলে ঘুরি। এখন তো আর বুটিকওয়ালার ছেলে নই, আমার নিজস্ব একটা পরিচয় আছে। যেটা লোকের কাছে লুকিয়ে রাখার মতো নয়। গর্ব করে বলার।

নন্দিনীকে তারিখটা জানিয়ে দিলাম, সময়। ঠিকানা লিখে দিলাম,

এমন কী একটা রাস্তার ম্যাপও এঁকে দিলাম।

দাদু প্রতিদিন থলি হাতে বাজার যায়, এখন আর গলায় টাই বাঁধা সেই সমীহ পাওয়া মানুষ নয়। তবু ডেসিগনেশনটার এখনও বাজারদর আছে। প্রয়োজন হলে এক ফাঁকে জানিয়ে দেব।

নির্দিষ্ট দিনে নিজেই গিয়ে বাজার করল। মিষ্টি কিনে আনল। আমাদের কোথাও কোনও স্বচ্ছলতার অভাব আছে তা যেন না ভেবে বসে।

ঠাকুমা অনেক আগে থেকেই ভাল একটা শাড়ি পরে নিয়েছে। দাদু ধোপদুরস্ত প্যান্ট বের করে রেখেছে, ফল্‌স্ কলারের শার্ট।

বাবা-মাকেও সব বলেছে ঠাকুমা। ক'দিন ধরেই ওরা খুব খুশি। যেদিন শুনেছে সেদিন থেকেই। মা প্রাণ ভরে আমাকে দেখছে। চোখে কৌতুকের হাসি।

এ বাড়িতে এত আনন্দ বহুদিন দেখিনি। আমার মনেও ফূর্তি ফূর্তি ভাব, কিন্তু একটু উদ্বেগও। নার্ভাস লাগছে।

ঘর সাফসুফ ঝকঝকে করে রেখেছে ঠাকুমা, জানালা দরজায় ধোপদুরস্ত পর্দা টাঙিয়েছে। আর মাঝে মাঝেই গিয়ে রান্নাঘরের তদারকি করছে। ওদের কাছে আমাদের একটা ধোপদুরস্ত চেহারাই তো উপস্থিত করবে।

ঠাকুমা হঠাৎ জিগ্যেস করল, অমু, মেয়েও সঙ্গে আসবে? একদিনও এনে দেখালি না।

আমি হেসে উত্তর দিলাম, জিগ্যেস করিনি। আসতেও পারে, ওরা যা মডার্ন।

তারপর : না এলে, তোমরা গিয়েও তো দেখতে পাবে।

—সে তো যাবই, যেতেই হবে।

নন্দিনীও আসতে পারে এই সম্ভাবনার কথাটা জানিয়েই আমারও ইচ্ছে হল ও যেন আসে। আবার আতঙ্ক, আমার সঙ্গে যে পোশাকে ঘুরতো, জিনস আর টপ পরে না চলে আসে। বলে দেওয়াও হয়নি। এখন ফোন করে বলাও যাবে না। দাদু সর্বক্ষণ ঘর গুছোচ্ছে। এটা ওখানে, ওটা এখানে, কিছুতেই যেন মনঃপূত হচ্ছে না।

মা হঠাৎ একসময় আমাকে জড়িয়ে ধরল, মাথায় কপালে গাল ঘষল।

বাবা মিটিমিটি হাসছে।

ঠাকুমা নিজের গলায় হাত ছুঁইয়ে ইশারায় মাকে বলল, সেই গিনিহারটা পর।

মা বুঝতে পারল। রাজি হয়ে দুবার মাথা নাড়ল।

আসলে ঠাকুমা চাইছে ওরা এসে যেন আমাদের স্বচ্ছলতা দেখতে পায়।

ঠাকুমাকে মা হঠাৎ জিগ্যেস করল, আসলে বোঝাল যে, মেয়ে যদি আসে তা হলে তাকে গলা থেকে খুলে পরিয়ে দেবে?

আমি শব্দ করে হেসে উঠলাম।

ঠাকুমা মায়ের কথায় সায় দিল। খুব খুশি। বুঝুক যে তোমাদের মেয়েকে আমরা মাথায় করে রাখব। আমার একমাত্র নাতির বউ হয়ে আসছে। আদরের অভাব হবে না।

মনে মনে ভাবলাম, দূর, কী সব আজেবাজে ভাবতাম, এই আনন্দের সংসার ছেড়ে কেউ দূরে সরে যায় নাকি! আলাদা ফ্ল্যাট? অসম্ভব। নন্দিনীও তা চাইবে না। চাইলে কোনওদিন না কোনওদিন এক ফাঁকে বলত।

অপেক্ষা করছি সকলেই, সকলের মধ্যেই কেমন একটা ছটফটানি।

ওঁদের যা কিছু খেতে দেওয়া হবে, মা আর ঠাকুমা নিজের হাতে করেছে। তখন মাইক্রো ওভেনে গরম করে দেবে।

বেল বেজে উঠল।

আমি দৌড়ে যাচ্ছিলাম, তার আগেই দাদু পৌঁছে গেছে।

সবাই তটস্থ।

—আসুন, আসুন। দাদু নন্দিনীর বাবা-মাকে এনে কুশন চেয়ারগুলো দেখিয়ে দিল। ওগুলোর কভার পাল্টানো হয়েছে আজই। দামী কাপড়ের কভার আলমারিতে তোলা থাকে। বিশেষ দিনের জন্যে। সারা বছর ওরা আটপৌরে পোশাকেই থাকে। মাঝে মাঝে সাবান দিয়ে কাচা হয়, মা নিজে ইস্ত্রি করে। বাড়ির কাছাকাছি রাস্তার ধারে ঝুপড়ি করে এক ইস্ত্রি-ওয়ালা আছে, তাকে দেয় না।

ভদ্রলোক আয়েস করে গা এলিয়ে বসলেন। নন্দিনীর বাবা।

ঠাকুমা নন্দিনীর মায়ের হাত ধরে নিয়ে এসে বসল।

নন্দিনীর বাবা হাসতে হাসতে বললেন, আজকাল তো ছেলেমেয়েরা আমাদের জন্যে কিছু রাখছে না, আসতে হয় তাই আসা। কেটারার আর ডেকরেটর তদারকির কাজটাই রাখছে।

ঠাকুমা বলল, মেয়েকেও তো আনলে পারতেন। এখন তো এটা ওরও বাড়ি। আমার নাতি...

দাদু হেসে উঠল। —সারপ্রাইজ দেবে বলে একটা দিনও আনেনি।

আমি কোনও রকমে মিউ মিউ করে বললাম, ও তো আসতেই চায়নি।

সবটা সত্যি নয়। আমি কোনওদিন তাকে নিয়ে আসতেই চাইনি। কেমন একটা ভয় ছিল। ওরা এত মডার্ন, ওর বাবা-মা এত খোলামেলা, আমি যে এতবার গিয়েছি, ওর পড়ার ঘরে এক দিনও উঁকি দেননি। ভয়, আমাদের বাড়িটা তেমন আধুনিক নয়, আমার ঘরে আমি ওকে নিয়ে গল্প করলে, কী পড়াশুনো করলে কেউ না কেউ গিয়ে দাঁড়াব। আমাদের মেয়ের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস, চোখেচোখে রাখার প্রয়োজন আছে বলেই মনে করে না।

তাছাড়া আমরা দু'জনই তখন পুরোপুরি অ্যাডাল্ট। চব্বিশ পার হয়ে গেছি দুজনেই।

প্লেটের পর প্লেট খাবার এল।

নন্দিনীর বাবা প্লেট নামাবার সময় মাকে বললেন, আপনার ছেলে তো একটি জুয়েল। নন্দিনীর কাছে শুনেছি।

মা কিছু বুঝতেই পারল না, কিছু না বলেই চলে গেল। মুখে একটু হাসিও দেখাল না। বুঝতে না পারলে হাসবে কি করে।

দাদুই কথাটা ভাঙল, অমুর বাবা-মা দুজনেই স্পিচলেস।

ওরা সপ্রশ্ন চোখে তাকালেন। বেশ বুঝতে পারলাম, দাদু ডেফ অ্যান্ড ডাম কথাটা এড়িয়ে গেলেন।

বললেন, আদারওয়াইজ দে আর নর্মাল। দু জনে মিলে একটা বুটিক চালায়, প্রফিটেবল বিজনেস।

নন্দিনীর মায়ের ভুরু কুঁচকে উঠেছিল কিনা লক্ষ করিনি।

দাদুর কথায় নন্দিনীর বাবা আদৌ হোঁচট খেলেন না। বললেন, আপনি তো তা হলে অসাধ্যসাধন করেছেন।

দাদু বলল, ওরা খবরের কাগজ বই সবই পড়ে, লিখতেও পারে। হিসেব টিসেব সব ওরাই রাখে, ব্যবসা চালায়। আমার পুত্রবধূ, অমুর মা বলতে গেলে ডিজাইন এক্সপার্ট।

নানারকম গল্পগুজব চলছে, ঠাকুমাও যোগ দিয়েছে।

খাবারের প্রশংসা করলেন ওঁরা।

ঠাকুমা বলল, সব আমার বউমা করেছে।

মায়ের হাত ধরে বিদায় জানালেন নন্দিনীর মা।

দাদু বলল, তা হলে আমাদেরও একদিন যেতে হয়। অবশ্য জাস্ট এ ফর্মালিটি।

নন্দিনীর বাবা হেসে উঠলেন, ছেলে-মেয়েরা সব ঠিকই করে রেখেছে যখন আমাদের শুধু ওইটুকুই কাজ। পাঁজি দেখা।

সবাই হেসে উঠল, নন্দিনীর মাও।

যাবার সময় বললেন, কবে যাবেন নন্দিনীর সঙ্গে কথা বলে জানাব।

একটু থেমে। —কিংবা ওই জানিয়ে দেবে। আবার হাসি।

ছেলে দেখা মেয়ে দেখার কোনও পাট নেই, খুবই হৃদ্যতার মধ্যে ওঁরা বিদায় নিলেন। দাদু-ঠাকুমা, মা-বাবা এবং আমি, সবাই মিলে সিঁড়ি ভেঙে নিচে নেমে গেলাম।

ইচ্ছে হল তক্ষুনি নন্দিনীকে ফোন করে জানাই। অনুযোগও করি : নিজেকে এত যে মডার্ন মনে কর, ওঁদের সঙ্গে আসতে পারলে না। সকলে

আশা করেছিল।

কিন্তু না, অপেক্ষা করে দেখি নন্দিনী নিজেই ফোন করে কিনা। ও ফোন করলে আর ছাড়তেই চায় না, সেজন্যে অফিসেই করে।

আমার বুকের মধ্যে পিয়ানো বাজছে। এই দিনটার জন্যে এত দিন ধরে অপেক্ষা করে ছিলাম। কত না স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্ন দেখেছে, দেখিয়েছে নন্দিনীও।

পরের দিন অফিসে গিয়ে অপেক্ষা করছি, অপেক্ষা করছি। নন্দিনীর কণ্ঠস্বর শোনার অপেক্ষায়। রাগও হচ্ছিল। অভিমান।

তার পরের দিনও ফোন এল না, আমিও করলাম না। আমিই বা এত ব্যগ্র হতে দেখাতে যাব কেন। নন্দিনীর কি উচিত ছিল না ফোন করার। আবার ভাবলাম, পাঁজিটাজি দেখে একেবারে বিয়ের দিন স্থির করার পরই ফোন করবে।

ওদের বাড়িতে যাওয়াটা তো এখন নিতান্তই ফর্মালিটি।

নন্দিনী অদ্ভুত মেয়ে। পরে অভিযোগ করলে বলে বসবে, তোমাকে একটু জ্বালাতে চাইছিলাম।

সেদিন অফিস থেকে ফিরেছি, পোশাক বদলে স্নান সেরে বিকেলের খাবার খেয়ে নিয়ে টি ভি-র সামনে একবার বসব কি না ভাবছি, দাদু নিজের ঘর থেকে ডাক দিল। —অমু, একবার শুনে যাও।

বাবা-মা এখনও বুটিক বন্ধ করে ফেরেনি, আর একটু পরেই এসে পড়বে। তাদের খাবার তৈরি করতে ব্যস্ত ঠাকুমা।

আমি ঘরে ঢুকতেই দাদু দরজা বন্ধ করে বলল, কথা আছে।

দাদুর মুখের দিকে চোখ তুলে তাকাতেই বলে উঠলাম, তোমার কি শরীর খারাপ নাকি!

দাদু জবাব দিল না। একখানা চিঠি এগিয়ে দিল। ডাকে এসেছে।

দাদুর নামেই চিঠি। আগেই খুলে পড়েছে।

চিঠিটা খুলে পড়লাম। আমার চোখে জল এসে গেল, মনে হল সারা শরীরে যেন কোনও শক্তি নেই।

'আপনাদের পরিবারটি আমাদের খুবই ভাল লেগেছিল। আমরা মেয়ের বাবা, একটু সংশয় নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু দু মিনিটেই সে সংশয় আপনাদের সৌজন্য ও ব্যবহারে দূর হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু অমৃতর বাবা ও মা দুজনেই যে ডেফ অ্যান্ড ডাম সে কথা নন্দিনীকে সে ঘুণাক্ষরেও জানতে দেয়নি কেন বুঝতে পারলাম না। দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, এ বিয়েতে আমাদের সম্মতি নেই। নন্দিনীও অসম্মতি জানিয়েছে। যদিও ও খুব ভেঙে পড়েছে। আপনারাও স্বীকার করবেন এ বিয়ে হওয়া উচিত নয়। বিয়ে হলে ওদের সন্তানও যে ডেফ অ্যান্ড ডাম হবে না এমন কোনও নিশ্চয়তা নেই। আমাদের মার্জনা করবেন। অমৃতকে বলবেন সেও যেন নন্দিনীকে মার্জনা করে।'

আমার হাত কাঁপছিল, চোখে জল।

দাদু এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বলল, সুশান যেন এ চিঠির কথা জানতে না পারে, মাকেও জানতে দিও না।

আমি তখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় বলতে যা বোঝায়।

দাদু ধীরে ধীরে বললেন, এমন একটা আঘাত পেলে, মানুষ নিজেকে শেষ করে দিতেও পারে।

তারপর। দেখো, ওরা যেন কিচ্ছু জানতে না পারে। বিয়ে ভেঙে দেওয়ার অন্য কোনও কারণ দেখিও।

এতকালের তিল তিল করে তোলার স্বপ্ন ভেঙে যাওয়ার দুঃখ। আর এক দিকে প্রচণ্ড ভয়ে, এমন একটা আঘাত পেলে, মানুষ নিজেকে শেষ করে দিতে পারে। মানে সুইসাইড।

আমার সারা শরীর কাঁপছে তখন।

প্রথমে প্রচণ্ড রাগ হয়েছিল। অভিমান। শেষে অনুনয়-বিনয় করব ভেবে নিজেই ফোন করেছি। বার বার, এনগেজড, এনগেজড। হয়তো ফোন নামিয়ে রেখেছে। প্রতারক ভেবেছে আমাকে।

আপনি বলুন, সত্যি কি ৫আমি প্রতারক?

আমি অনেকবার ভেবেছি, বাবা-মা'র কথা আমি নন্দিনীকে বলে ফেলব। কিন্তু পারিনি। কারণ, আমার আশঙ্কা ছিল, আমার কথা শুনে হয়তো হেসে উঠবে, সারাজীবন তো ভুলতে পারিনি, বাবা-মাকে দেখে বা তাদের হাত আর আঙুলের ভাষায় কথা বলতে দেখে আত্মীয়স্বজনরাও কেমন ঠোঁট টিপে হেসেছে। সে হাসি যে উপহাসের বুঝতে অসুবিধে হয়নি। আমি বাবা-মার সেই অপমান সহ্য করতে পারি না। সেই যে বিয়ে বাড়িতে গিনিহার পরা মাকে আমার রানীর মতো লেগেছিল, কী গর্ব, আর তখনই এক ভদ্রমহিলার বক্রোক্তি 'অত সাজগোজ করলে কি হবে, আসলে তো বোবা-কালা', কথাটা আমার এখনও কানে বাজে। আমার মনে হয়েছিল নন্দিনী হেসে উঠলে বাবা-মার অপমান হবে, সে অপমান আমি সহ্য করতে পারব না। আমি প্রতারক নই, আমি লজ্জা গোপন করতে চেয়েছিলাম। সকলেই তো নিজের কিংবা পরিবারের লজ্জার দিকটা গোপন করে। নন্দিনীকে ভালবেসে সত্যিই কি কোনও দোষ করেছিলাম। হয়তো নন্দিনীকে হারাবার ভয়ও ছিল। জানি না। নন্দিনীদের পরিবারকে তার বাবা-মাকে আমি শিক্ষিত এবং আধুনিক বলেই জানি। তাঁরাও ঠিকুজি কোষ্ঠী দেখা সঙ্কীর্ণ মনের মানুষের মতো একটা দুঃখজনক অ্যাক্সিডেন্টকে বংশগত রোগ ভেবে বসলেন?

আপনার হাতেই বিচারের ভার দিলাম। আপনি তো আপনার লেখায় মানুষকে নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করেন। তাকে বিশ্লেষণ করেন। তার বুকের ভেতর অবধি দেখতে পান। সেজন্যেই আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম আমার জীবনের কথা নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখুন। আমি তো লেখক নই। জানি না কী ভাবে উপন্যাস লিখতে হয়। আপানার সৌজন্যের জন্যে ধন্যবাদ। আমি কৃতজ্ঞ, আপনি আমার চিঠির উত্তর দিয়েছেন। আমার জীবনের কথা লিখে পাঠাতে বলেছেন। এই আমার জীবন।

শুধু একটা অনুরোধ আপনার কাছে। যদি সত্যি আমাকে নিয়ে আপনি কোনও উপন্যাস লেখেন, অন্য অনেকে যা করে বসেন, আপনি অন্তত আমার বাবা-মাকে সুইসাইড করাতে বাধ্য করবেন না। সে আমি সহ্য করতে পারব না। তার চেয়ে নন্দিনী হঠাৎ একদিন অনুতপ্ত হয়ে আমার কাছে ছুটে এসেছে, মার্জনা চেয়েছে, আর আমি সব অভিমান ভুলে সব দুঃখ দূর করে দিয়ে তার দিকে দু' হাত বাড়িয়ে দিয়েছি, মা ঠাকুমার দেওয়া গিনিহারটা খুলে নন্দিনীর গলায় পরিয়ে দিয়েছে এমন একটা চিরাচরিত দৃশ্য দিয়েও যদি শেষ করেন, আমি খুশিই হব। অন্তত কল্পনার মধ্যেও তৃপ্তি পাব।

এখনও ভাবি, মানুষের কি সত্যি নিজস্ব কোনও পরিচয় নেই, কোনও একক আইডেনটিটি। পিছনের ইতিহাস কি তাকে অনন্তকাল তাড়া করে বেড়ায়!

This Book Downloaded From
http://Doridro.com

*অঙ্কন : সুধীর মৈত্র*